ডাক্তার কুঠি - অজেয় রায় Dakter Kuthi by Ajeo Ray

অন্ধকারেও বাড়িটা চিনতে,শেখরের ভুল হল না। গেটের দু পাশে দুটো খাড়া শাল গ উল্টো দিকে মাঠের মাঝে সেই বটগাছটা আরও ডালপালা ছড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে।

ক্যাচ!

শেখরের হাতের ঠেলায় পুরনো লোহার গেট মৃদু প্রতিবাদে পথ ছেড়ে সরে গেল চারপাশ নিঝুম। কোনো জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে আলোর রেশমার নেই। একটু এগিয়ে শেখর ডাকল—ব্রজদাদু! ও ব্রজদাদু!

কোনো উত্তর মিলল না।

অন্ধকার বারান্দায় উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শেখর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। দরজায় শিকল ভোলা এবং কড়ায় একটা মস্ত তালা লাগানো।

শেখর হতভম্ব হয়ে গেল। এমন অসময়ে কোথায় গেলেন ব্রজদাদু? গেটের বাইরে এসে পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসল সে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সামনে পিচঢালা চওড়া রাস্তাটা শহরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দুর পাহাড়ের কোলে। বসন্তকালের শুরু। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। রাত সাতটা না বাজতেই আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। আকাশে ক্ষীণ একফালি চাঁদ। এধারে লোকের বসতি খুব কম। ইতিমধ্যেই পথঘাট খাঁ খাঁ করছে। অনেক তফাতে তফাতে যে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ছে, সেগুলো গাছপালায় ঢাকা যেন জমাট কালো স্তুপ। দূরে আকাশপটে পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো রেখা।

দীর্ঘ পনেরো বছর আগে শেখর একবার এসেছিল এখানে। তখন তার বয়স কত হবে? এই দশ-এগারো বছর। দু'দিন ছিল দেওঘরে এই বাড়িতে।

ব্রজদাদু সম্পর্কে শেখরের মায়ের কাকা হন। দেওঘরে আছেন বহুকাল। বিয়ে থা করেননি, ধার্মিক প্রকৃতির লোক। মাকে খুব স্নেহ করতেন। কলকাতার এক প্রতিবেশিনীরসঙ্গে মা এসেছিলেন বৈদ্যনাথ দর্শনে। তখন বাবা মাত্র বছরখানেক হল মারা গিয়েছেন। ব্রজদাদুর কাছে উঠেছিলেন তারা। ব্রজদাদু কত যত্ন করেছিলেন তাদের! শেখরকে কত গল্প বলতেন!

আর দেওঘরে আসা হয়নি। দু-তিন বছর পরে পরে ব্রজদাদু একবার কলকাতায় যেতেন। প্রত্যেকবার দেখা করতেন তাদের সঙ্গে। মা মারা যাওয়ার পর আর দেখা হয়না। তবে নিরালা অবসরে ওই মানুষটির কথা শেখরের অনেক সময় মনে জেগেছে। বিশেষত মা চলে যাওয়ার পর। নিঃসঙ্গ শেখর একটি স্নেহশীল হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার জন্য কখনও লালায়িত হয়েছে। তখন ব্রজদাদুর কথা মনে পড়েছে তার। প্রতিবছর বিজয়ার পর ব্রজদাদুর একখানা চিঠি আসে শেখরের কাছে আশীর্বাদসহ। সেও জবাব দেয় প্রণাম জানিয়ে। এ বছরও এসেছে চিঠি। এই ঘোর বিপদের সময় প্রাণভয়ে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে ব্রজদাদুর কথাটাই শেখরের মনে এসেছিল। সে জানত, আত্মগোপনের পক্ষে 'এখন নিরাপদ আশ্রয় আর তার কোথাও নেই দুনিয়ায়।

ছয় দিন ধরে সে ঝড়ের মতো ঘুরছে। কোথাও একবেলা, কোথাও বড়জোর ঘণ্টা। দশ-বারো কাটিয়ে আবার নিঃসাড়ে সরে পড়েছে সর্দার কৃপাল সিংয়ের নির্মম মৃত্যু থাবার আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে থাকে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে সে বার বার জায়গা বদল করেছে, পথে হঠাৎ হঠাৎ বাস আর ট্রেন বদল করেছে, আজ সারাদিন তার বাস জার্নি গিয়েছে।

প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তার লৌহ-কঠিন স্নায়ু ও পেশি এখন অবসন্ন। মাথাটা টিপটিপ করছে। অনেকখানি হেঁটে ক্লান্ত পা দুটো আর নড়তে চাইছে না।| তার বরাতটাই আজ খারাপ। সাইকেলরিকশা ভাড়া করে আসছিল। মাঝামাঝি এসে রিকশার একটা চাকার টায়ার গেল ফেটে। রিকশাওলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ফিরে গেল। বলেছিল, একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব বাবু?

অতক্ষণ অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয়নি। তাই বারণ করে সে হাঁটা দিয়েছিল। এদিকে আধঘণ্টা কেটে গেল। ব্রজদাদু এখনও ফিরছেন না কেন? সহসা নিস্তব্ধ পথের বুকে জেগে উঠল জুতোর শব্দ—খটখট। কে একজন এগিয়ে আসছে শহরের দিক থেকে। সে কাছাকাছি আসতেই টর্চের তীব্র আলো পড়ল শেখরের মুখে।

শেখর চকিতে উঠে দাঁড়াল। ডান হাতটা ঢুকে গেল তার প্যান্টের পকেটে। ক্ষুদ্রকায় আগ্নেয়াস্ত্রটির শীতল ধাতব বাটটা আঁকড়ে ধরল আঙুল।

আগন্তুক দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ। পরনে হাওয়াই শার্ট ও ফুলপ্যান্ট। মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । তবে মনে হচ্ছে, তারই বয়সি যুবাপুরুষ ও ভদ্রসন্তান। শেখর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে নিল লোকটিকে, মনের গহনে হাতড়ে দেখল ওই মুখ, ওই ভঙ্গি তার পরিচিত কিনা। কৃপালসিংকে বিশ্বাস নেই। তার জাল যে কত বিস্তৃত শেখর তা জানে।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কে ?

না, লোকটিকে চেনা বলে মনে হচ্ছে না। সাদামাটা মুখ, শ্যামলা রং, বড় বড় চোখ দুটোয় কৌতূহল।

সহজভাবে শেখর উত্তর দিল, এই বাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু বাড়ি তালাবন্ধ। বোধহয় বেরিয়েছেন ব্রজদাদু। তাই অপেক্ষা করছিলাম।

এবার শেখরের হাতের ব্যাগটার ওপর আগন্তুকের দৃষ্টি পড়ল—আপনি কি বাইরে থেকে এসেছেন বেড়াতে?

—কিন্তু ব্রজগোপালবাবু তো তিন-চার দিন হল কাশী চলে গিয়েছেন। মাস ছয় থাকবেন শুনেছি। আপনি জানতেন না বুঝি?

না তো। -শেখর রীতিমতো অবাক। ব্রজদাদু হঠাৎ চলে গেলেন কেন? যাক, শেষ আশ্রয়ের ভরসাটুকুও মিলিয়ে গেল।

এবার কী কর্তব্য? কোথায় যাবে সে? বিপুল হতাশা তার দেহ-মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে । জড়িয়ে ধরল। | শেখরকে চুপ করে থাকতে দেখে আগন্তুক যুবক প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাবেন এখন? চেনা-শোনা আছে কেউ এখানে?

–না। দেখি কোনো হোটেল-টোটেলে....

—তাই তো, মুশকিল হল। এখন ফিরতে গাড়িটাড়ি কিছু পাবেন কিনা সন্দেহ। তারপর রাতে হোটেল খোঁজা...

শেখর নীরব।

একটা কাজ করতে পারেন। পথচারী একটু ইতস্তত করে বললেন, চলুন আমাদের বাড়িতে। একটা রাত কাটিয়ে দেবেন।

শেখর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, ব্যাপার কী? কিন্তু আগন্তুকের চোখে মুখে আতিথ্য-প্রদর্শনের নিছক সরল আগ্রহ ছাড়া আর কিছু তো আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। প্রায় চার মাইল হেঁটে বাজার অঞ্চলে ফেরার কল্পনায় শ্রান্ত শরীর বিদ্রোহ জানাল। অগত্যা সে বলল, বেশ চলুন। কোন্ দিকে? মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট নিচ্ছেন।

—বিন্দুমাত্র নয়। আর একটু যেতে হবে। অবশ্য আপনার হোটেলের চেয়ে ঢের কাছে। যেতে যেতে যুবক জিভেস করলেন, কোত্থেকে আসছেন? জামশেদপুর। ইচ্ছে করে মিথ্যে বলল শেখর। যুবক বললেন, আমার নাম মৃগাঙ্ক দত্ত। এখানে তিন বছর আছি। এক ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করছি। বাধ্য হয়ে শেখরকে তার পরিচয় দিতে হল।

—আমি শেখর মিত্র। সেলস্-এ চাকরি করি। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম ক'দিন রেস্ট নেব ব্রজনাপুর বাড়িতে। তা কপাল খারাপ।

নামটা ভুল না বললেও পদবিটা পালটেছে শেখর। সে মিত্র নয়, সরকার। আর জীবিকা? সামান্য সেলসম্যান। সুরভি ইনডাস্ট্রিজ-এর প্রশাধন দ্রব্য বিক্রি করে

ঘুরে ঘুরে। বাইরের লোক সেটাই জানে। কিন্তু তার আসল রূপটি টের পেলে এই নিরীহদর্শন যুবক কি তাকে যেচে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেত না।

আধ মাইলটাক এগিয়ে পিচ রাস্তা থেকে হাত পঞ্চাশ বাঁ দিকে নেমে উচু পাঁচিল-ঘেরা এক বাড়ির গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে।

দু'পাশে ছোট-বড় গাছের ভিড়। মাঝখানে সুরকি-বিছোনো পথ ধরে এগোতে এগোতে শেখর দেখল, সামনে প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ি। বাড়ির ওপর ও নিচের তলায় কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। ওরা আধো অন্ধকার উঠোনে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে সারমেয়কণ্ঠের গভীর গর্জনে কেঁপে উঠল নিশীথের স্তব্ধতা। পরক্ষণেই যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল এক বিশাল অ্যালসেশিয়ান। তার রুপোলি-লোমভরা গায়ে আলো পড়ে যেন পিছলে যাচ্ছে। জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ সবুজ দু'টি চক্ষুতারকা।

মৃগাঙ্কবাবু মৃদু ধমক দিতেই কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল আড়ালে।

বুধন।—ডাকলেন মৃগাঙ্কবাবু।

এবার প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো চত্বরের কোণ থেকে এগিয়ে এল এক বিভীষণ মূর্তি নিঃশব্দ পদে। লোকটা অন্তত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মুখখানা কুৎসিত। থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট, ঝাকড়া চুল। তার ওপরে একটা চোখ নষ্ট। ওই চোখটার মণি য্যাটম্যাটে সাদা অন্য চোখটা লালচে কুতকুঁতে। একখানা শুধু খাটো ধুতি পরনে, দৃঢ় পেশিবদ্ধ দেহে দানবীয় শক্তির ইঙ্গিত।

মুহূর্তে শেখর সতর্ক হয়ে উঠল এক অশুভ সম্ভাবনায়। রহস্যময় বাড়ি, রহস্যময় এর বাসিন্দারা। ডাক্তারের পরিবার-পরিজন কোথায়? কোনো মহিলা বা ছোট ছেলের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কেন! সবাই কি শুয়ে পড়েছে? রাত তো এমন কিছু বেশি হয়নি। মৃগাঙ্কবাবুকে ও যতটা সরল বলে ভেবেছে, সত্যি কি তা-ই?

যাই ফিরে? কিন্তু শেখর যেন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। একটি উষ্ণ কোমল শয্যায় গা ঢেলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার শরীর উদগ্রীব। যা হয় হবে, দেখা যাক।

কোনো ফাঁদে পা দিলাম না তো? এর চেয়ে বরং ব্রজদাদুর বাড়ির বারান্দায় শুয়ে রাত কাটানো বা হেঁটে বাজার অঞ্চলে গিয়ে হোটেল খোঁজা বুদ্ধিমানের কাজ হত।

মৃগাঙ্কবাবু সেই ভয়ালদর্শন লোকটিকে বললেন, বুধন, ওপরে গেস্ট-রুমে বিছানা করে দাও। ইনি থাকবেন রাত্তিরে।

আস্তে মাথা ঝাকিয়ে বুধন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

চলুন ওপরে। —ডাকলেন মৃগাঙ্কবাবু। সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল তারা। শেখর লক্ষ করল, বাড়িখানা পুরনো আমলের, তবে মজবুত।

দোতলার একটা ছোট্ট ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, বসুন। বিশ্রাম নিন। কী খাবেন? রুটি, না ভাত?

—কিচ্ছু না। ক্ষিদে নেই মোটে। মৃগাঙ্কবাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেল

—আপনার শরীর খারাপ নাকি?

-না, না, একটু মাথা ধরেছে। রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

বেশ তবে শুয়ে পড়ুন। ঘরখানায় এবার চোখ বুলিয়ে নিল শেখর। সিঙ্গল-বেডের পরিচ্ছন্ন বিছানা, অল্প ক'টি আসবাব, লাগোয়া বাথরুম।

কিছু দরকার আছে?—মৃগাঙ্কবাবু জানতে চাইলেন।

—না ধন্যবাদ।

আচ্ছা, চলি তবে। গুড নাইট। —মৃগাঙ্ক দত্ত বিদায় নিলেন।

দরজার ছিটকিনিটা ভাঙা। কী ব্যাপার? একটা টেবিল টেনে এনে শেখর ভেজা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। বারান্দার দিকের জানলা বন্ধ করল। শুধু বাইরের দিককার জানলাটা রইল আধখোলা। সাবধানের মার নেই। তারপর তড়িঘড়ি জুতো-মোজা, পোশাক-আশাক খুলে রাতের পাজামাটা গলিয়ে নিয়ে, ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। রিভলভারটা ঢুকিয়ে রাখল পাশে টুলের ওপরে রাখা ব্যাগের মধ্যে। চোখ বুজল শেখর।

দুই

অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে কানে অর্থহীন, দুর্বোধ্য। | একটু একটু করে চেতনা ফিরে পায় শেখর, ঘুম ভাঙে। কপালে হাত দিয়ে মনে হল, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। দরজায় জোরে জোরে টোকা দিচ্ছে কেউ-শেখরবাবু, ও শেখরবাবু, চা এনেছে।

মৃগাঙ্কবাবু ডাকাডাকি করছেন। টলতে টলতে উঠে টেবিল সরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে শেখর এসে বিছানায় বসে পড়ল।

উঃ, আচ্ছা ঘুম আপনার। ভোরে ডেকে দিতে বললেন কেন কাল? নইলে বিরক্ত.. —মৃগাঙ্ক দত্তর কথা আটকে গেল।

কী ব্যাপার? কী হয়েছে? তিনি শেখরের হাত চেপে ধরলেন—উঃ, এ যে ধুমজুর! শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন।

একটু বাদে অপরিচিত গম্ভীর মৃদু কণ্ঠের কথা শুনে শেখর চোখ মেলল। বিছানার ধারে মৃগাঙ্কবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়। গায়ে কমলা রঙের ড্রেসিং গাউন। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। মোটা ফ্রেমের চশমার পুরু কাচের পিছন থেকে ঝকঝকে দুই চোখের দৃষ্টি শেখরের ওপর নিবদ্ধ। উচ্চতা মাঝারি। গৌরবর্ণ শীর্ণ চেহারা। চওড়া কপাল, উন্নত নাসা ও চাপা ঠোঁটে ব্যক্তিত্ব ও মনীষার সাক্ষ্য।

মৃগাঙ্কবাবু লোকটিকে স্যার বলে সম্বোধন করে কী জানি বললেন। ইনিই তাহলে সেই ডাক্তার ডাক্তার ব্যানার্জি। এই বাড়ির মালিক।

শেখর আবার চোখ বোজে। স্টেথোস্কোপের শীতল স্পর্শ অনুভব করে বুকে-পিঠে। কেমন ঘোর-ঘোর লাগে তার। দু-চারটে অস্ফুট কথাবার্তা কানে আসছে। কিন্তু কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারে না তার দুর্বল মস্তিষ্ক। একবার মৃগাঙ্কবাবু একটু জোরে বললেন শেখরকে, আপনার বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার। ঠিকানাটা বলুন তো। কাকে খবর দেব?

না, না, তার দরকার নেই। -শেখর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

পাঁচদিন পরে শেখরের জ্বর ছাড়ল। অসুখের প্রথম দু-দিন সে জ্বরের ঘোরে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছিল। এই পাঁচটা দিন তার জীবনে যেমন কষ্টের, তেমনি সুখের।

অসুখ-বিসুখে শেখর বহুকাল ভোগেনি। তাই নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হচ্ছিল।

তাছাড়া বিদেশ-বিভুঁইয়ে এমন পঙ্গু হয়ে পড়ার ভাবনা। তার ওপর শারীরিক কষ্ট। যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো ছিড়ে যাচ্ছিল যেন। কিন্তু এমন সেবা-যত্নও সে বহুকাল পায়নি।

মৃগাঙ্কবাবু দিনের বেশিরভাগ সময় দরজার গোড়ায় চেয়ারে বসে বই পড়তেন আর নজর রাখতেন রোগীর ওপর। ওষুধ ও পথ্য খাওয়ানো, জ্বরতপ্ত কপালে জলপট্টি দেওয়া ইত্যাদি রোগীর প্রায় যাবতীয় পরিচর্যা তিনি করতেন। এছাড়া এক বয়স্কা পরিচারিকাও দেখাশোনা করত। তার নাম কালোর মা। ডাঃ ব্যানার্জিও আসতেন মাঝে মাঝে, পরীক্ষা করতেন রোগীকে।

জ্বরের সময় এক দুপুরে একটা কথা মনে পড়ে যেতে শেখর চমকে উঠেছিল। চেয়ে দেখল, তার ব্যাগটা ঘরের কোণে টেবিলের ওপর রয়েছে। দরজা ভেজানো, ঘরে কেউ নেই। এ-ই সুযোগ। কোনোরকমে উঠে গিয়ে সে ব্যাগটা খুলল। চাবি লাগানো নেই। প্রথম রাতে চাবি দেওয়া হয়নি, তেমনই আছে।

রিভাললাভারটা? হ্যা, রয়েছে ওপরে। ব্যাগ ঘেঁটেছিল কি কেউ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে।

খবরের কাগজে জড়িয়ে রিভলভারটা ও রেখে দিল জামা-কাপড়ের একদম তলায়। তারপর চাবি দিয়ে দিল ব্যাগে।

জুর ছেড়েছে, কিন্তু শেখরের শরীর বেজায় দুর্বল। আরও কয়েকদিন সে ঘোরাঘুরি করার শক্তি পাবে না। তার জ্বর ছাড়ার পরদিনই মৃগাঙ্কবাবু কোথায় যেন গিয়েছিলেন দু’দিনের জন্যে। কালোর মা বলেছিল, কাজে বাইরে গেছে।

তিন-চার দিন পরে শেখর অল্প অল্প বাইরে বসা ও হাঁটাহাঁটি শুরু করল। মৃগাঙ্কবাবু বেশ আমুদে প্রাণখোলা মানুষ। শেখর বলেছিল, আপনাদের শুধু শুধু বিব্রত মৃগাঙ্কবাবু থামিয়ে দিলেন—ফের ওই কথা। শরীরটা কিন্তু সারিয়ে যেতে হবে।

মৃগাঙ্ক দত্তর বাড়ি নাকি দুর্গাপুর। উনি নিজেও পাশ-করা ডাক্তার। দেখে মনে হয়, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

মৃগাঙ্কর মতো উচ্চশিক্ষিত মার্জিত লোকদের শেখর পছন্দ করে না। ওর মনের ভিতর এদের সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলে। এরা সফল, সুখী, আরামে লালিত। এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শেখরের মতো দারিদ্র্য ও অপমানের সঙ্গে এদের বুঝতে হয়নি, হবেও না কখনও। সংসারে এইরকম ভগবানের অনুগ্রহপুষ্ট জীবগুলিকে শেখর ঘৃণা করে। এরা শেখরকে বড়জোর স্বার্থসিদ্ধির আশায় খাতির করতে পারে, করুণা করতে পারে, কিন্তু ভালোবেসে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। তাই মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে বেশি ভাব জমাতে তার আগ্রহ নেই। যদিও একটা কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে। শেখরের সঠিক পরিচয় পেলে এখুনি ওঁর ভদ্রতার মুখোশ খুলে যাবে, এটা সে জানে। উনি নিশ্চয়ই শেখরকে তার সমগোত্রীয় কেউ ঠাউরেছেন, শেখরের চেহারা, পোশাক বা চালচলনে ভুল বুঝেছেন।

তবে মৃগাঙ্কবাবু বা ডাক্তার ব্যানার্জি দু'জনেই সত্যি ভদ্র এবং তাদের অহেতুক কৌতূহল কম। শেখরের আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার আর প্রশ্ন তোলেননি, শেখর বলতে অনিচ্ছুক বুঝে। তা, কটা দিন এখানে কাটাতে পারলে মন্দ হয় না।

এখানে থাকবার ব্যাপারে বিচিত্রভাবে প্রস্তাব এল স্বয়ং ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে।

এসে দাড়ালেন—কেমন আছ শেখর ?

সকালে বারান্দায় বসে ছিল শেখর, ডাঃ ব্যানার্জি এসে দাড়ালেন—কেমন আ শরীরে জোর পাচ্ছ তো?

শেখর উঠে দাঁড়াল।

বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে—ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে বসান সামনে-শোনো শেখর, তোমার শরীরে একটা মারাত্মক গোলযোগ আবিষ্কার করেছি। এক্ষুনি ট্রিটমেন্ট না করাও, তবে কিছুদিনের মধ্যেই রোগ সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

শেখর আঁতকে উঠল—মানে এই অসুখ থেকে বুঝি!

-না, না, এই অসুখ তেমন কিছু নয়। খারাপ ধরনের ফু হয়েছিল। সেরে গিয়েছে। আরও কটা দিন রেস্ট নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

শেখরের মনে পড়ে গেল, তার বাঁ দিকের পাঁজরায় মাঝে মাঝে একটা ব্যথা ওঠে। বছর সাত আগে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিল বলের। হয়তো তা-ই থেকেই...সে ঢোক গিলে বলল, কী অসুখ?

—নাম শুনে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না। আমি এখন বলতেও চাই না পেশেন্টকে। তোমার চিকিৎসা আমি নিজেই করতে চাই। আমার ধারণা, আমি তোমায় সারিয়ে তুলতে পারব। আমি যদি না পারি, ভারতবর্ষের কেন পৃথিবীর অন্য কোনো ডাক্তার তোমার এই রোগ সারাতে পারবে কি না সন্দেহ। করবে চিকিৎসা? ট্রিটমেন্টে অন্তত তিন মাস সময় নেবে।

শেখর থতমত খেয়ে গেল। একটা অজানা আতঙ্ক তার বুকে চেপে বসে। ডাঃ ব্যানার্জিকে তো বাজে বকার লোক বলে মনে হয় না। মৃগাঙ্কবাবুর মুখে শুনেছে, ডাঃ ব্যানার্জি একজন নামকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। একসময় ডাক্তার হিসাবে বিপুল পসার ছিল। কিন্তু হঠাৎ প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে এখন কেবল রিসার্চ নিয়ে ডুবে আছেন। এই কাজে মৃগাঙ্ক। দত্ত তার সহকারী। সুতরাং ডাঃ ব্যানার্জির মতামত উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমতা আমতা করে বলল শেখর, সারবে তো?

—সারবে বইকি, নিশ্চয় সারবে। আর যদি নাও সারে, এখন যে অবস্থায় আছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু হবে না। মাস তিনেকের মধ্যেই বুঝতে পারব আমার ট্রিটমেন্টের ফলাফল। যদি ফেল করি, তোমার রোগের নামটা বলে দেব। তখন অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে পার ইচ্ছে হলে।

আমায় কি মাঝে মাঝে এখানে আসতে হবে?—শেখর জিজ্ঞেস করল। —না, কারণ তোমায় এখানেই থাকতে হবে। —এখানে! কিন্তু এখানে তো কেউ চেনা নেই আমার। —বেশ, তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে। এ চিকিৎসা দূরে থেকে হয় না। -খরচ-পত্তর, টাকাকড়ি? —সে তোমায় ভাবতে হবে না।

—আমি দু'দিন ভেবে দেখি ডাক্তারবাবু। চাকরি রয়েছে, তাছাড়া আরও দু-একটা কাজ..

—অলরাইট, দেখ ভেবে। তাড়াহুড়ো নেই। যদি রাজি থাক, চার-পাঁচ দিন পরে ট্রিটমেন্ট শুরু হবে।

ডাঃ ব্যানার্জি বিদায় নিলেন।

শেখরের মনে দুর্ভাবনা দানা বেঁধে ওঠে। এ কোন অজানা ভীষণ ব্যাধি তার দেহে বাসা বেঁধেছে? ভয়ে সে দিশাহারা বোধ করে। একটা সন্দেহ জাগে। তাকে এখানে আটকে রাখার, ফাঁদে ফেলার টোপ নয় তো এটা? কিন্তু তাহলে অসুখের সময় এরা এত যত্ন করবেন কেন? বুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। শেখর ঠিক করল, প্রথমে এই বাড়ি এবং এর অধিবাসীদের খুঁটিয়ে লক্ষ করা দরকার।

ডাক্তার কুঠিতে—ডাক্তার কুঠি নামটা এই বাড়ির চলতি স্থানীয় নাম—একতলাদোতলা মিলিয়ে দশ-বারোটা ঘর। চারধারে বিরাট কম্পাউন্ড। বাগানের মধ্যে একটা আউট হাউস ও পরিচারকদের কয়েকটি ঘর। দোতলায় দক্ষিণমুখী টানা বারান্দা।

দোতলায় থাকেন ডাক্তার ব্যানার্জি এবং মৃগাঙ্কবাবু। ডাক্তারের শয়নকক্ষের গায়ে এক প্রকাণ্ড ঘরে ল্যাবরেটরি। পাশের ঘরে লাইব্রেরি। নিচের তলায় বাস করে বাড়ির কয়েকজন। কয়েকখানা ঘর তালাবন্ধ থাকে।

প্রশস্ত ছাদ। ছাদের সিঁড়ির মাথায় চিলেকোঠায় তানেক খাঁচা। গিনিপিগ, ইদুর, বাঁদর ইত্যাদি নানারকম জীব-জন্তু বন্দি রয়েছে খাচাগুলোয়। ল্যাবরেটরিতে একবার উকি দিয়েছিল শেখর। ঘরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, সারি সারি তাক ও লম্বা লম্বা টেবিল, অজস্র শিশি-বোতল, টেস্টটিউব সাজানো। সাদা অ্যাপ্রন-পরা ডাঃ ব্যানার্জি মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে মগ্ন। কীসের তীব্র কটু গন্ধ এল নাকে, কোনো ওষুধ বা অ্যাসিডের গন্ধ বোধহয়। বাড়ির লোকদের ভালো করে নজর করে শেখর। খবরাখবর নেয় যতদূর সম্ভব।

বাড়িতে ডাঃ ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কবাবু ছাড়া থাকে কালোর মা, কালো, বুধন, ফাগুলাল, দীননাথ ঘোষ এবং অ্যালসেশিয়ান কুকুর-রাজা।

ডাঃ ব্যানার্জি সম্পর্কে শেখর বিশেষ কিছু জানতে পারেনি। শুধু জেনেছে, তিনি সংসারে প্রায় একা, স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ছেলে-পুলে নেই। আগে থাকতেন কলকাতায়। বছর চারেক দেওঘরে এসেছেন। ডাক্তার প্রায় সারা দিন এবং গভীর রাত অবধি ল্যাবরেটরিতে কাটান। মামুলি কথা বা গল্প করেন দৈবাৎ। সর্বদা গম্ভীর। কখনও কখনও বারান্দায় বসে চুপচাপ পাইপ টানেন।

কালোর মা রান্না-বান্না করে। প্রৌঢ়া। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। কিন্তু সমানে বকবক করে চলেছে নিজের মনে।।

কালো দশ-বারো বছরের ছেলে। ভারি দুষ্ট, ছটফটে। সারাটা দিন হুটোপাটি করে বেড়ায়। কালোর মা সর্বক্ষণ ছেলেকে সামলাচ্ছে। কালোর মিষ্টি মুখখানি হাসি-খুশিতে জুল। অ্যালসেশিয়ান কুকুর রাজার সঙ্গে তার বেজায় ভাব এবং খুনসুটি।

বুধন হল সেই কদাকার দর্শন ভৃত্য। অদ্ভুত নিঃশব্দ তার চলাফেরা। মুখে কথা শোন। যায় কদাচিৎ।

ফাগুলাল মালী। সুশ্রী সুগঠিত চেহারা। বছর ত্রিশ বয়স। কাধ-ছোঁয়া ঘন বারবি। ডান গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন মুখখানাকে একটু বিকৃত করেছে। নইলে অনায়াসে এতে যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুর সাজানো চলত। বাগান করা ছাড়াও সে বাঁশ ও তালপাতা দিয়ে মোড়া, টুকরি ইত্যাদি জিনিস বানায়। নিজের মনে থাকে, গুনগুনিয়ে গান গায়। দীননাথবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। বেশ সপ্রতিভ চটপটে ব্যবহার। ঘড়িঘর মানে বাজার অঞ্চলে তার একটা ছাপাখানা আছে। রোজ সকালে বেরোন, রাতে ফেরেন। কালোর মা বলেছে, দীননাথবাবু লোক ভালো। খুব অভাবে পড়েছিলেন। ডাক্তারবাবু ব্যবসা করতে টাকা দিয়েছেন। দু'বছরের মধ্যে ব্যবসা বেশ বাড়িয়ে ফেলেছেন। বউছেলে-মেয়েরা থাকে দেশের বাড়ি বারাসতে।

রাজা দিনের বেলা সাধারণত ছায়ায় পড়ে ঘুমোয় বা ঝিমোয়। খুব কমই সে চেয়ে বাঁধা থাকে। বেশির ভাগ সময় থাকে খোলা। কখনও কখনও মৃগাঙ্কবাবু বা ডাক্তারের কাছে এসে একটু দাঁড়ায়, আদর খায়। রাতে সারা বাড়ি টহল দেয়। কালোকে খুব ভালোবাসে। ওকে এত জ্বালাতন করে ছেলেটা—কান টানে, ঘাড়ে চড়ে, তবু চটে না। বেশি ব্যতিব্যস্ত করলে গুটিগুটি সরে পড়ে।

দোতলার বারান্দায় টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন রয়েছে। শেখর মৃগাঙ্কবাবুকে জিজ্ঞেস করল, একটা ফোন করতে পারি? ট্রাংক কল।

-কোথায়?

-কলকাতায়, আমার অফিসে। দেখি ছুটির কী ব্যবস্থা করা যায়।

-হা হা, নিশ্চয়ই করবেন। সুযোগ খুঁজছিল শেখর। সকাল ন'টা নাগাদ ডাক্তার এবং শেখর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই সে বন্ধুর দোকানের নাম্বার বুক করল।

শিয়ালদার কাছে স্টেশনারি দোকান আছে বঙ্কুর। কিন্তু সে গোপনে চোরাই মালের বেচাকেনা করে এবং শেখরের বিশ্বস্ত অনুচর। ঘণ্টাখানেক পর লাইন পাওয়া গেল।

—হ্যালো, বঙ্কু আছে?

-আমি বঙ্কু বলছি।

—আমি শেখর।

..হ্যাল্লো বস্, তুমি! আমি তো ভাবলাম....

-কী?

-মানে হাপিস হয়ে গেলে বুঝি! কোথায় আছ এখন? উঃ, খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।

—ঠিকানাটা পরে জানাব। আপাতত বল অফিসের খবর কী?

অফিস?

আঁ! বঙ্কু ভ্যাবাচ্যাকা খায়। শেখর আবার অফিস বসাল কবে? যে কোম্পানিতে শেখর চাকরি করে, তাদের অফিস-কাছারি নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা, আছে বলে তো জানে না। কিন্তু বঙ্কু ধুর্তের শিরোমণি। চট করে বুঝে নিল, শেখর রেখেঢেকে ইঙ্গিতে কথা বলছে। কাছাকাছি হয়তো কেউ আছে। সে জবাব দিল, অফিসের খবর মানে কারবারের গতিক ভালো নয়। সিংয়ের গ্যাঙ তোমায় খুজছে। খুব সাবধান!

—জানি।

কলকাতা থেকে এখন কিছুদিন দূরে থাক বস্।

—হম্। কয়েকটা কাজ করে রেখ। ইদ্রিস শেখকে বলবে, ও যদি আমার হয়ে কাজ করতে রাজি থাকে, দু’গুণ কমিশন পাবে। আর গোমেজকে বলবে, ব্রীজরামকে সিং ভাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছে। বুঝেছ?

-রাইট বস্।

সিড়িতে কার পদশব্দ? শেখর তক্ষুনি গলা চড়িয়ে বলল, শোন, ম্যানেজারকে বলবে, আমি খুব অসুস্থ। ট্রিটমেন্টের জন্যে ছুটি চাই। অন্তত দু-তিন মাস। দরখাস্ত পাঠাচ্ছি। একটু বুঝিয়ে বোলো প্লিজ! তুমি বললেই হবে।

'কালোর মার আবির্ভাব ঘটল। হাতে ট্রেতে দু'কাপ ধুমায়িত চা। সে ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে গেল।

ওদিকে বন্ধু আবার ধাঁধায় পড়েছে। হঠাৎ এক ম্যানেজারের আমদানি হল কোথেকে। তবু সে সামলে নিয়ে বলল, ইয়েস বস।

শেখরের অবশ্য অফিসের ম্যানেজারকে খবর দেওয়ার আপাতত কোনো দরকার নেই। কারণ কলকাতা ছাড়ার সময়ই সে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে ডাকে।

কালোর মা ল্যাবরেটরিতে ঢুকল।

আচ্ছা, আজ রাখছি বন্ধু, পরে খবর দেব।—শেখর রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

চোরাচালানকারী কৃপাল সিংয়ের দাপট সে এবার চূর্ণ করবেই। এই কৃপাল সিংয়ের হয়ে সে ইদানীং নিষিদ্ধ নেশার বস্তু পাচার করত নানা জায়গায়। কিন্তু লোকটা হাড়কিপটে। কাজ হাসিলের পর রেট-মাফিক পারিশ্রমিক দিতে চাইত না। অসন্তুষ্ট শেখর তাই নিজে ' স্বাধীনভাবে এই ব্যবসা করার মতলব আঁটে। ছোটখাটো একটা দল তার ইতিপূর্বে ছিল। খবরটা পৌঁছে যায় সিংয়ের কানে। সে শেখরকে ডেকে পাঠায় তার আস্তানায়'। শাসায়— ফের এমন আস্পর্ধা দেখলে চাবকে তোমার চামড়া তুলে নেব।

সামনাসামনি প্রতিবাদ করতে সাহসে কুলোয়নি, কিন্তু রাগে শেখরের রক্ত টগবগ করে। উঠেছিল। চোখরাঙানিতে মাথা নোওয়াবার পাত্র সে নয়। কয়েকদিন পরে সিংয়ের এক গুপ্ত আড্ডায় পুলিশ হানা দিয়ে উদ্ধার করে বহু টাকার কোকেন। সিংয়ের দলের দু'জন গ্রেফতার হয়। সিং আঁচ করে, শেখরই পুলিশকে খবর জানিয়েছে বেনামী চিঠি দিয়ে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে শেখরকে খুন করার চেষ্টা হয়। বেশি রাতে ঘরে ফিরছিল সে। একটা মোটর ফুটপাথ ঘেঁষে আস্তে এগিয়ে এল তার পিছনে। সদাসতর্ক শেখর।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, গাড়ির জানালায় উকি মারছে চকচকে রিভলভ মহর্তে সে দৌড়তে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে দু-দু'বার গুলি ছোড়ার শব্দ। আছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাক। পরদিনই ভোরে শেখর কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়।

গুন্ডা ইদ্রিস শেখকে লোভ দেখিয়ে দলে ভেড়াতে পারলে অনেকটা জোর পাবে? আর গোমেজের সঙ্গে সিংয়ের যদি একটা খিটিমিটি বাধিয়ে দেওয়া যায়, তো কেল্লা গ্রত গোমেজও চোরাকারবারি। খিদিরপুর ডক এলাকায় তার রাজত্ব। দুর্দান্ত গোঁয়ার। তাই সাকরেদ ব্রীজরামকে সিং দলে টানবার চেষ্টা করছে জানলে গোমেজ ছেড়ে কথা কইরে

যাক, আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। আত্মগোপনের এমন চমৎকার। জায়গা আর পাওয়া যাবে না। সেইসঙ্গে রোগের চিকিৎসাটাও হয়ে যাক মুফতে।

বিকেলে শেখর ডাঃ ব্যানার্জিকে জানাল, অফিসে ছুটি নিলাম। আমি চিকিৎসা করাতে চাই আপনার কাছে।

তিন

শেখরের চিকিৎসা শুরু হল।

দৈনিক একটা করে ইঞ্জেকশন, তাছাড়া দুটো করে খাওয়ার পিল। অনেকখানি তরল গাঢ় হলুদরঙা পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হত তার শিরায়। সাতদিনে ইঞ্জেকশনের কোর্স শেষ হল। কিন্তু পিলটা চলবে সপ্তাহে একটা করে আরও দু মাস।

শেখরের দেহ থেকে রক্ত ইত্যাদির নমুনা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল কয়েকদিন। তবে কী ওষুধ, কী রোগ, শেখর তার কিছুই জানতে পেল না। কয়েকবার সে জিজ্ঞেস করেছিল ডাঃ ব্যানার্জিকে তিনি বলেছিলেন, পরে জানতে পারবে।

চিকিৎসা চলার সময় কেমন ঝিমুনি ভাব আসত। ক্লান্তি বোধ হত। ক্রমে শেখর চাঙ্গা হয়ে উঠল। দিনে দিনে শুধু যে তার শরীর সুস্থ হতে থাকল তা-ই নয়, মনও তার একটা উৎফুল্ল প্রশান্তিতে ভরে উঠল। প্রথম প্রথম সে বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতর ঘোরাঘুরি করত, তারপর সে বাড়ির বাইরে বেরোতে আরম্ভ করল। অবশ্য শহর-বাজারের দিকে সে বড় একটা যেত না-লোকজনের ভিড় ওর পছন্দ নয়। তাছাড়া যদি হঠাৎ চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

এই অঞ্চলের উদার প্রকৃতি, বনময় গিরিশ্রেণি বন্ধুর রুক্ষ লালমাটির বুকে শাল-মহুয়াতাল-খেজুরের সারি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগন্তরেখায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপূর্ব বর্ণালি—এইসব দৃশ্য চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে সাধ হয় শেখরের। যদি একটা ক্যামেরা পাওয়া যেত! একসময় খুব ফোটোগ্রাফির শখ ছিল তার।

মৃগাঙ্কবাবুকে বলতে তিনি বললেন, আমার একটা আছে, তবে খারাপ। সারানো হয়নি।

—কই, দেখি। ক্যামেরাটা নিয়ে দেখল শেখর! ভালো জিনিস। জাপানি ইয়াসিকা-৬৩৫। ক্যামেরাটা সে খুলল। দু দিন ধরে মন দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝল, বিশেষ কিছু নষ্ট হয়নি, এক-আধটা ছোট্ট পার্টস শুধু বদলানো দরকার। বাজারে গিয়ে ক্যামেরার দোকানের খোঁজ করে সে ওইসব পার্টস কিনে লাগিয়ে নিল। ব্যস এবার ছবি উঠবে। কয়েক রোল ফিল্মও কিনে আনল শেখর তারপর অনেক ছবি তুলল এবং নিজেই ডার্ক-রুম বানিয়ে ছবি ডেভেলপ করল। হাতে প্রচুর অবসর। কিছু করার জন্যে শেখর ছটফট করে।

একটা বড় দেয়াল-ঘড়ি ঝোলে ওপরের বারান্দায়। বড্ড স্লো যাচ্ছে ঘড়িটা। শেখর সেটা নামিয়ে খুলে তেল দিয়ে, সামান্য টুকিটাকি করতেই ঘড়িটা দিব্যি সঠিক সময় জানাতে লাগল।

দেখে-শুনে মৃগাঙ্কবাবু তাজ্জব। বললেন, বাঃ, আপনার কলকজার মাথা তো খুব সাফ! আর ফোটোগ্রাফির হাতটিও চমৎকার। টাইম-পিস সারাতে পারেন?

—চেষ্টা করতে পারি। মৃগাঙ্কবাবু একটা বন্ধ টাইম-পিস্ ঘড়ি হাজির করলেন। তিন দিনের মধ্যে শেখর ঘড়িটা চালু করে ফেলল। বহু যত্নে নানারকম ছোটখাটো যন্ত্রপাতির কাজ শিখেছে ও নিজে নিজে। কখনও শখে, কখনও প্রয়োজনের

তাগিদে। এ বিষয়ে সত্যি তার প্রতিভা আছে। তার নিজের উদ্ভাসিত একগোছা তারের যন্ত্র থাকে তার ব্যাগে, অতিদুরূহ তালা বা সিন্দুক সহজেই খোলা যায় তাদের সাহায্যে।

শেখরের ছেলেবেলার আর একটি শখ এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—ছবি আঁকা। একবাক্স জল-রং ও আঁকার কাগজ কিনে ফেলল ও। বাগানে আউট হাউসের একটা খালি ঘর হল তার স্টুডিও। নানারকম মেরামতি নিয়ে বা ছবি এঁকে সে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেয় এই ঘরে। | ডাঃ ব্যানার্জির কাজে ছুটি পেলে মাঝে মাঝে মৃগাঙ্কবাবু আসেন আড্ডা দিতে। একদিন তাকে প্রশ্ন করল শেখর, আচ্ছা, ডাক্তার ব্যানার্জি কী নিয়ে রিসার্চ করছেন?

একটু চুপ করে থেকে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, বিষয়টা জটিল। এখন বলতে পারব না, মাপ করবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, ওঁর সাধনা সফল হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তা এক যুগান্তকারী ব্যাপার হবে।

ডাঃ ব্যানার্জি সম্বন্ধে একটা কথা প্রায়ই মনে হয় শেখরের—লোকটি যেন চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছি এই মুখ, কিংবা পরিচিত কারো সঙ্গে এই মুখের ভারি আদল। কিন্তু কার সঙ্গে! কিছুতেই সে মনে আনতে পারে না।

একদিন ডাক্তার কুঠিতে শেখর একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করল। নিচের তলায় একটা ঘর সব সময় তালাবন্ধ থাকে। একদিন শেখর দেখে, সেই ঘরটার দরজা খোলা, ভিতরে কালোর মা এবং মৃগাঙ্কবাবু। শেখর উকি মারল।

ঘরে লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপর বড় বড় কাচের বাক্স অর্থাৎ শো-কেস। শো-কেসের মধ্যে নানারকম মূর্তি। কালোর মা ঝাটা দিয়ে ঘরের ধুলো ও ঝুল সাফ করছে। মৃগাঙ্কবাবু শেখরকে ডাকলেন—ভিতরে আসতে পারেন, তবে বড় নোংরা।

শেখর ভিতরে ঢুকল। মূর্তিগুলো দেখে সে রীতিমতো অবাক। পনেরো-যোলোটা বড় প্রাচীন ধাতু বা কাঠের দেব-দেবীর মূর্তি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের।

শেখর জানতে চাইল—এগুলো কার?

—ডাক্তার ব্যানার্জির সংগ্রহ। একসময় খুব ঝোক ছিল স্যারের পুরনো মূর্তি জেলা করার। অনেক টাকা খরচ করেছেন এর পিছনে। আজকাল গবেষণা নিয়ে

স্যার এমন বাত থাকেন যে, এগুলো আর চেয়েও দেখেন না। আমি বলি, "দিয়ে দিন কোনো মিউজিয়ামে।"

তা-ই নাকি?—শেখর এমন ভাব দেখাল যেন এই বিষয়ে সে নেহাতই অজ্ঞ। আসলে কিন্তু সে এইরকম মূর্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিছুদিন সে এক প্রত্নদ্রব্যের চোরাচালানকারী দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তখন ভালো করে চিনেছিল মূল্যবান প্রাচীন মূর্তির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য।

একটা বিষ্ণুমূর্তির সামনে গিয়ে শেখর থ। ফুটখানেক উঁচু অষ্টধাতুর মূর্তিটা। অন্তত হাজার-বারোশো বছরের পুরনো। এ জিনিস বিদেশিদের কাছে বিক্রি করতে পারলে, কমসে কম বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা মিলবেই।

নির্বিকারভাবে মূর্তিগুলি এক-এক করে দেখে নিয়ে শেখর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শেখর প্রায়ই পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়। কখনও পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়। কখনও পাহাড়ে ওঠে। একদিন মৃগাঙ্কবাবু ডেকে বললেন, দেখুন শেখরবাবু বন-পাহাড়ে বেশি দূর একা একা ঘুরবেন না। পথ হারিয়ে বিপদে পড়বেন। তাছাড়া ভাল্লুক আছে। জঙ্গলে। বুধন কিংবা ফাগুলাল কাউকে সঙ্গে নেবেন।

বুধনকে শেখর আদৌ পছন্দ করে না। তাই এর পর থেকে দূরে গেলে ফাগুলালকে সঙ্গে নেয়। ফাগুলাল একটা বর্শা নেয় হাতে। লোকটি ভারি নম্র প্রকৃতির। এখানকার গাছপালা, পাহাড়ি বনপথ—সব তার নখদর্পণে। তবে ফাগুলালকে বাইরে থেকে শেখর যতটা নিরীহ মনে করেছিল, একটা ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেল, তা ঠিক নয়।

এক বিকেলে তারা পাহাড় থেকে নামছিল আঁকাবাঁকা সরু পথ বেয়ে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে, শেখর সামনে, পিছনে ফাগুলাল। হঠাৎ ফাগুলাল চেঁচিয়ে উঠল—দাঁড়ান বাবু!

শেখর চমকে মাথা তুলে দেখে, ঠিক ওপরে গাছের ডালে জড়িয়ে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক সাপ। সাপটা তাক করছে শেখরকে, চওড়া ফণাটা ফুলে ফুলে উঠছে, দীর্ঘ শরীরটা একটু গুটোনো, পলকহীন দুই চক্ষুর হিংস্র দৃষ্টি শেখরের পানে নিবদ্ধ। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল শেখর।

চকিতে সাঁ করে কী যেন ছুটে গেল কানের পাশ দিয়ে, মুহর্তে সাপটা বর্শার আঘাতে ছিটকে পড়ল মাটিতে। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার ঘায়ে সাপের ফণা দু ফাঁক হয়ে গেছে।

বাঃ, দারুণ টিপ তো!-শেখর অভিনন্দন জানাল ফাগুলালকে—তুমি নিশ্চয়ই ভালো শিকারি। তির-ধনুকে শিকার করেছ? "ফাগুলাল বলল, হ।

-বন্দুক ছুড়তে পার? —ই। —বন্দুক দিয়ে করেছ শিকার? ফাগুলাল একটু বিব্রতভাবে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ 'হ'।

শুধু শিকারি নয়, ফাগুলাল শিল্পীও বটে। কোনো কোনো রাতে সে বাগানে বসে বাঁশি বাজায়। নিঝুম প্রকৃতিরাজ্যে সেই মিঠে-করুণ সুরের ধ্বনি কী অপরূপ মায়াজাল বোনে।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে একজনের দেখা পেয়ে গেল শেখর। ইন্সপেক্টর খাস্তগির। অবশ্য অধুনা অবসরপ্রাপ্ত।

সেদিন ভোরে দেব-সংঘের দিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল শেখর। গেরুয়া ধুতি ও ফতুয়া গায়ে এক বৃদ্ধ এলেন উল্টো দিক থেকে। বুক অবধি লম্বা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুলসব ধবধবে সাদা। সামনাসামনি হতে শেখর অবাক—ইন্সপেক্টর খাস্তগির এখানে! এ কী মূর্তি তার। বৃদ্ধ কিন্তু শেখরকে লক্ষ করেননি। আনমনে পেরিয়ে গেলেন। | শেখরের হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে খানিকটা বিষাক্ত স্মৃতি উপচে এল। দারোগা খাস্তগির—দুদে নিষ্ঠুর। কত দিন সে ভেবেছে, এই লোকটিকে যদি একবার সে বাগে পায় তাহলে পুরনো অপমানের শোধ তুলবে। . . তখন শেখর কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। এক বন্ধুর সঙ্গে সন্ধে নাগাদ গিয়েছিল চীনেপট্টিতে। বন্ধুটি ছিল বয়সে বড় এবং বখাটে ধরনের।

ঘুপচি গলির ভিতর এক বিরাট পুরনো বাড়িতে ঢুকেছিল তারা। সেখানে একটা ঘরে পাঁচ-ছ জন লোক বাজি রেখে তাস খেলছিল। আসলে সেটা ছিল গোপন জুয়ার আড্ডা। শেখর ওই বন্ধুর সঙ্গে আগেও ওখানে গিয়েছিল কয়েকবার। এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার উত্তেজনা হত। তবে নিজে সে খেলেনি জুয়া। সাহস করেনি, তাছাড়া পয়সার অভাবেও বটে। সেদিন বন্ধুটি খেলতে বসে গেল আর শেখর হাঁ করে দেখছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় পুলিশ হানা দিল আড্ডায়। অন্যান্যদের সঙ্গে শেখরকেও তুলে জিনিয়ে পুরল হাজতে। এই খাস্তগীর দারোগা

তাকে বেদম মারধর করেছিলেন। শেখর কাতর অনুনয় জানিয়েছিল—আমি জুয়া খেলিনি স্যার, আর এখানে আসব না কখনও। দারোগা কান দেননি।

পরদিন কাকা তাকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। ভাগ্যক্রমে কেস হয়নি, কিন্তু বাড়িতে ও পাড়ায় তার কম লাঞ্ছনা জোটেনি। ভীষণ দুর্নাম রটে গিয়েছিল। কেবল মা ছাড়া কেউ বোধহয় বিশ্বাস করেনি তার কথায়? প্রথমে দুঃখ হয়েছিল, তারপর রাগ—দুরন্ত ক্ষোভ। এরপর সে ইচ্ছে করেই লুকিয়ে লুকিয়ে কুসঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। এই খাস্তগির দারোগা যদি সেদিন তার কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতেন, ঘটনাটা জানাজানি না হত, তবে হয়তো তার জীবন ভিন্ন ধারায় বইত।

আশ্চর্য, আজ কিন্তু খাস্তগিরকে দেখে সেই পুরনো রাগ আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল না। শুধু কৌতূহল হল। খানিক তফাতে থেকে তাকে অনুসরণ করল শেখর। মাঠের মাঝে খড়ের চালার মাটির বাড়ি। চারপাশে কিছু জায়গা বেড়ায় ঘেরা। ভিতরে ফুল-ফলের বাগান। বৃদ্ধ খাস্তগির ঢুকলেন বাড়িতে। গেটে কাঠের ফলকে লেখা : নারায়ণ কুটীর।

—নারায়ণ কুটীরে কে থাকে?

প্রশ্ন শুনে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, খাস্তগিরবাবু। আগে পুলিশে ছিলেন। হঠাৎ ট্রেনদুর্ঘটনায় স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে মারা যায়। সেই শোকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসেন। প্রায় সন্ন্যাসী মানুষ। গরিব-দুঃখী লোকের খুব উপকার করেন। একা একাই থাকেন নির্জনে।

শেখর ভাবল কী অদ্ভুত মানুষের নিয়তি! সেই জাদরেল দারোগা এখন সাধু। পাহাড়ের সানুদেশে একটা পাথরে বসে শেখর অনুভব করে, কলকাতার রেষারেষি-উত্তেজনাময় দিনগুলো বুঝি মুছে গিয়েছে। সেই দুর্বার স্রোতে আর না পাড়ি দিলেই বা ক্ষতি কী? এই দেড় মাসের মতো নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ সে বহুকাল পায়নি। ভারি সুখে কাটছে। ইচ্ছে করে না আর ছেড়ে যেতে।

কিন্তু ডাক্তার কুঠির কয়েকটি ব্যাপারে শেখরের মনে দেখা দিল সংশয় ও অশান্তি। " প্রথমতঃ, ডাঃ ব্যানার্জি সম্বন্ধে একটা ভয় দানা বেঁধে উঠছে। লোকটি কি ঠিক সুস্থ বা স্বাভাবিক? উনি কখন খান, কখন শুতে যান কোনো হদিশ করা যায় না। কোনো কোনো দিন শেখর গভীর রাতে ঘুম ভেঙে শুনেছে খট খট খট—

ডাক্তারের জুতোর শব্দ। বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি সমান তালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, অবিশ্রান্তভাবে।

শেখর খেয়াল করেছে, এক-এক সময় ডাক্তার তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কী তীব্র সে চাউনি! বুকের ভিতরে শিরশির করে ওঠে। কী নিয়ে ওঁর রিসার্চ? মৃগাঙ্কবাবু তো দিব্যি প্রাণখোলা গল্পে লোক। তিনি কেন পড়ে আছেন এই ডাক্তারের কাছে? এই পাগলা ডাক্তারের হাতে চিকিৎসা করানো উচিত হল না বোধহয়।

এক দুপুরে একতলার বারান্দায় বসে শেখর ছবি আঁকছিল। কাছে শুয়ে ছিল অ্যালসেশিয়ান রাজা। রাজা চেনে বদ্ধ। কারণ সকালে দু জন মজুর এসে বাগানে কাজ শুরু করতেই রাজা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লোক দুটি ঘাবড়ে গিয়ে কাজ করতে চায় না। তখন রাজাকে বেঁধে রাখা হয়। এখনও রাজার মেজাজ শান্ত হয়নি। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বাগানের দিকে তাকিয়ে গরগর করছে। শেখর তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দোতলা বারান্দার কোণ থেকে এইদিকে চেয়ে আছেন মৃগাঙ্কবাবু। চোখাচোখি হতে তিনি অপ্রস্তুতভাবে চট করে সরে গেলেন।

কী ব্যাপার! মৃগাঙ্কবাবু কি লুকিয়ে লক্ষ রাখছিলেন তাকে? এ সময়ে তো উনি নিজের ঘরে শুয়ে থাকেন, বাইরে আসেন না। শেখরের মনে পড়ল, গতকাল সন্ধ্যায় মৃগাঙ্কবাবু দোতলা থেকে ঝুঁকে কাউকে খুজছিলেন, কাউকে নজর করার চেষ্টা করছিলেন। শেখর বাগানে ছায়ায় বসে ছিল, তাই মৃগাঙ্কবাবু তাকে দেখতে পাননি। আজ সকালে শেখর যখন এখানে বসে ছবি আঁকছিল, মৃগাঙ্কবাবু যেন ছুতোনাতা করে বারবার দোতলার কোণে এসে তাকাচ্ছিলেন এই দিকে। মৃগাঙ্কবাবুর এই আচরণ শেখরের বেশ অস্বাভাবিক লাগল।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ বাগানে স্টুডিওতে বসে শেখর কয়েকটা সদ্য-প্রিন্ট-করা ফোটো পরীক্ষা করছিল। একসময় বাইরে থেকে কথাবার্তার শব্দ ভেসে এল-ডাঃ ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কবাবু আসছেন এধারে।

স্যার, আমার কিন্তু ভয় করছে-নিচু স্বরে মৃগাঙ্কবাবুর কথা শোনা গেল।

-কেন?

—যদি কিছু বিপদ ঘটে! আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো নয় কি? আপনি কী বলেন? জেনে-শুনে এমন রিস্ক নেওয়া কি উচিত?

না না, আমি ওকে আরও ওয়াচ করতে চাই। তবে সাবধানে থেক। বি কেয়ারফুল। বুধন আর ফাগুলালকেও বলে রেখো নজর...ডাঃ ব্যানার্জির কথা আচমকা থেমে গেল। পরক্ষণেই বললেন, ঘরে কে?

আমি।–সাড়া দিল শেখর। আর ওঁদের কথাবার্তা শোনা গেল না।

একটু পরে মৃগাঙ্কবাবু মুখ বাড়ালেন স্টুডিওর দরজায়—কী করছেন মশাই এত সকালে?

শেখর দেখল, ডাক্তার ফিরে যাচ্ছেন ধীর পায়ে।

অন্যমনস্কভাবে মৃগাঙ্কবাবুর কথার উত্তর দিল শেখর। তার মনের ভিতরে তখন তোলপাড় চলছে: এরা কার বিষয়ে সাবধান হচ্ছেন? আমি কী? হয়তো তা-ই। ওরা কি কিছু জানতে পেরেছে আমার সম্বন্ধে? কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু বা ডাঃ ব্যানার্জির বাইরের ব্যবহারে তো তেমন কোনো লক্ষণ নেই।

তবু শেখরের মনে একটা বিশ্রী সন্দেহ ও অস্বস্তি জাগে।

বাকি অংশ পড়ুন এখানে

ডাক্তার কুঠি   অজেয় রায়

আগের অংশ পড়তে এখানে ক্লিক করুন

চার

তিন-চার দিন পরে ডাক্তার কুঠিতে দু'জন বিচিত্র অতিথির আবির্ভাব ঘটল।

সকাল দশটা নাগাদ একটা ট্যাক্সি এসে ঢুকল বাড়িতে। গাড়ি থেকে নামলেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা ও একটি বছর ত্রিশের যুবক। মহিলা বেশ গাট্টাগোট্টা জাঁদরেল টাইপের। সাদা থান-পরা। যুবকটি রোগা ছোটখাটো, পরনে ধুতি-শার্ট। এই বাড়িতে বাইরের লোকের আগমন কদাচিৎ ঘটে, বিশেষত ভদ্রলোক বা মহিলার, তাই শেখর কৌতূহলের সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল যুবক। চলে গেল গাড়ি। মহিলা ততক্ষণ চারদিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি বাজখাই গলায় বলে উঠলেন, হ্যারে হাবু, এ কোথায় আনলি? এটা তো সেই ডাক্তারের বাড়ি।

যুবকটি মিনমিন করে বলল, হ্যা পিসি, ভাবলাম এলাম যখন দেওঘর, দেখা করে যাই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

তোর মতলবটা কী শুনি?–মহিলার গলা আর এক পর্দা চড়ল—ফের সেইরকম চিকিচ্ছে করাতে চাস বুঝি? খবরদার হাবু, ফিরে চল। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

যুবক এদিক-ওদিক সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে তাকাতে বলল, আহা, চটছ কেন? একট দেখা করে যেতে ক্ষতি কী? কত বড় ডাক্তার! তোমার প্রেশার-টেশার একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই বরং।

ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার!—পিসি গর্জন ছাড়লেন—কেন আমার হয়েছেটা কী? দিবি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমুচ্ছি। এখনও একশো লোকের রান্না করতে পারি একা হাতে। কোনো কালে একটা জ্বর-জ্বালা হয়েছে দেখেছিস? তুই বরং ডাক্তার দেখা, বেটা পেট-রোগা কোথাকার। উঃ, সেবার রোগের নাম করে মিছিমিছি কী যন্ত্রণাই দিলে! কতগুলো ইঞ্জেকশন ফুড়ল আর ওষুধ গেলাল খামোকা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। যতসব জোচ্চোর, টাকা খসাবার ধান্দা! এসব ডাক্তার আমি খুব চিনি।

উত্তেজনায় ও রাগে মহিলার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। হাবু বলল, ডাক্তারবাবু মোটেই ফি চাননি।

—ডাক্তার চায়নি বলে আমি দেব না কেন? আমি কারো দয়া নিই না। ওর সমস্ত ফি মিটিয়ে দিয়েছি আগের বার, মনে রাখিস। তবে হ্যা, বাজে খরচ করা আমার অভ্যেস নয়। তাছাড়া রোগের নাম পরিষ্কার করে বলছে না কেন?

—আহা, তুমি বুঝছ না পিসি। এ একরকম নতুন রোগ। এখন টের পাচ্ছ না, কিন্তু একদিন মারাত্মক হবে। এ রোগের নাম বললেও তুমি ঠিক বুঝবে না। বাংলা নাম নেই কিনা।

পিসি চোখ পাকিয়ে বললেন, কেন বুঝব না? মুখ বলে? দেখ, বেশি চালাকি করিসনি। রোগ-রোগ করে ভয় দেখিয়ে আমায় সত্যি রোগী বানিয়ে ফেলতে চাস। তারপর চটপট বুড়ি মরলে টাকাগুলো বাগাৰি। সেই মতলবে আছিস। ডাক্তারের সঙ্গে ষড় করেছিস বুঝি?

—আঃ, কী যা-তা বলছ!

—ঠিকই বলছি। ফের চিকিচ্ছের নাম করলে তোকে আমি বঞ্চিত করব বলে রাখলুম। উইলে একটা পয়সাও দেব না। ঢের হয়েছে। এখন চ শিগগির! বলেই ভদ্রমহিলা খপ করে হাবুর হাত চেপে ধরে টানতে লাগলেন।

শেখর চমৎকৃত হয়ে দেখছিল। ক্ষীণকায় হাবু পিসির প্রবল আকর্ষণে যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা করতে পারত কিনা সন্দেহ, কিন্তু সেই মুহূর্তে মৃগাঙ্কবাবুর আগমন তাকে বাঁচিয়ে দিল।

মৃগাঙ্কবাবু দ্রুত পায়ে এসে সটান মহিলার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে হেসে বললেন, এই যে পিসিমা, কেমন আছেন? বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

পিসিমার মুখেও হাসি ফুটল। বোঝা গেল, মৃগাঙ্কবাবুকে তিনি পছন্দ করেন। বললেন, হ্যা বাছা, বৈদ্যনাথ দর্শনে এসেছি। এই হাবুটার কাণ্ড দেখ, বলে কিনা আমার প্রেম দেখাবে। কেন; 'আমার হয়েছেটা কী? একদিনও মাথা ঘোরে না, দুর্বল লাগে না। দিন-রাত অসুখ-অসুখ ওর এক বাই। নিজে ভোগে যে!

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, সত্যি, আপনাকে তো চমৎকার লাগছে! পারফেকটুলি ফিট। কিচ্ছ দরকার নেই প্রেশার দেখাবার। চলুন, একটু চাটা খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে তারপর যাবেন।

পিসি সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, ডাক্তার কোথা?

কাজ করছেন ল্যাবরেটরিতে। উনি এখন আসবেন না। —বেশ, চল।। পিসি মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে এগোলেন। পিছনে পিছনে চলল হাবু। শেখরও তাদের অনুসরণ করল।

পিসিকে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু নিজের ঘরে ঢুকলেন। ভাইপো হাবু দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। ভেতর থেকে পিসি ও মৃগাঙ্কবাবুর গল্পের আওয়াজ ভেসে আসছে। হাবু ও ডাঃ ব্যানার্জির ওপর পিসির রাগ তখনও পড়েনি। মাঝে মাঝেই গরম হয়ে ওদের নামে কী সব বলছেন। একটু পরেই ল্যাবরেটরির দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জিকে দেখেই হাবু প্রায় ছুটে তার কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল, ডাক্তারবাবু, পিসিমাকে এনেছি অনেক কষ্টে। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন তো?

তারপর গলা আরও নামিয়ে কী জানি সে বলতে লাগল, শেখর শুনতে পেল না। ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ভিতরে এসো।

ল্যাবরেটরিতে ঢোকার মুখে ডাক্তারের চোখ পড়ল শেখরের দিকে। কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, কী করছ এখানে? নিজের ঘরে যাও।

শেখর অপ্রস্তুত হয়ে ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য, তার কিছুক্ষণ পর থেকেই পিসিমার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। অথচ তিনি এই বাড়িতেই আছেন। দোতলায় একটি ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তারের ধমক খেয়ে সোজাসুজি উকি মারতে সাহস হয়নি শেখরের। তবে ওই ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে জানলা দিয়ে আড়চোখে দেখেছে, ভদ্রমহিলা বিছানায় শুয়ে। ঘুমুচ্ছেন বলেই মনে হয়েছে শেখরের। তারপর পুরো দুটো দিন তিনি বোধহয় শুয়েই কাটালেন। সকাল সন্ধ্যায় যখনই শেখর ঘরের পাশ দিয়ে গিয়েছে, লক্ষ করেছে সেই এক দৃশ্য। স্বাভাবিক ঘুম নয় নিশ্চয়ই। শেখরের সন্দেহ হল, ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। এরপর অবশ্য তিনি উঠলেন, চলাফেরাও করলেন, তবে ঘরের মধ্যেই।

ডাঃ ব্যানার্জি এবং মৃগাঙ্কবাবু প্রায়ই ভদ্রমহিলার ঘরে যেতেন। শেখর বুঝল, কোনো চিকিৎসা চলছে। কীসের চিকিৎসা?

কালোর মাকে হাবুর পিসিমা সম্বন্ধে গোপনে জিজ্ঞেস করল শেখর। কালোর মা বলল, ওই বুড়ির মেলাই টাকা। মলে সব নাকি ওই ভাইপো পাবে। আগে একবার এসে থেকেছিল এখানে। বাপ রে, কী মেজাজ বুড়ির!

–ওঁর রোগটা কী? কালোর মা বলল, কী জানি বাবু, তা বলতে পারব না।

একদিন বাগানে বসে ডাক্তার কুঠির একটা পুরনো সাইকেল অয়েলিং করছিল শেখর।

হঠাৎ খসখস আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হাবু, তাকে একদৃষ্টে দেখছে। হাবুই কথা

শুরু করল—হে হে, আপনি বুঝি থাকেন এখানে?

হু।

—কেউ হন নাকি এদের ?

- না।

—তবে?

শেখর এবার একটু অস্বস্তি বোধ করে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ফেলল, আমি মৃগাঙ্কবাবুর বন্ধু। বেড়াতে এসেছি।

–ও তা-ই নাকি? আমি ভেবেছিলাম....তা, থাকেন কোথায়?

জেরার ঠেলায় শেখর বিব্রত! ঢোক গিলে বলল, কলকাতা। —বেশ বেশ। কী করা হয় মশাইয়ের?

এই চাকরি। -শেখর রীতিমতো বিরক্ত। নিজে প্রশ্ন করবে কি, সে তখন ছাড়া পেতে পারলে বাঁচে। লোকটা তাকে কথা বলার ফুরসতই দিচ্ছে না। হাবু চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে বলল, মশাইকে কোথায় যেন দেখেছি।

শেখর চমকে গেল। কে জানে, অতীত জীবনে হয়তো এর সংস্পর্শে এসেছিল ও। কিন্তু মনে তো পড়ছে না। বলল, কোথায় বলুন তো?

মনে হচ্ছে রাঁচিতে। আমরা ওখানেই থাকি। রাচি শেখর গিয়েছে কয়েকবার। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। সেখানে কেউ কেউ তার গোপন পরিচয় জানে। তার মনে পড়ল, একটা চায়ের দোকানে এই হাবুর সঙ্গে একবার সামান্য আলাপ হয়েছিল বছর চারেক আগে। কিন্তু মুখে সে স্রেফ অস্বীকার করল—রাঁচি তো আমি যাইনি কখনও। আপনি ভুল করছেন। আচ্ছা চলি, আমার একটু কাজ আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে সরে পড়ল শেখর। কে জানে, হাবুর সূত্র ধরে যদি তার অজ্ঞাতবাসের জায়গা ফাস হয়ে যায়। আর সে পারতপক্ষে হাবুর ধারে-কাছে। ঘেঁষছে না।

দিন চারেক পরে এক বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে শেখর আবিষ্কার করল, হাবু ও তার পিসিমা চলে গিয়েছেন। যাওয়ার আগের দিন পিসিমা বারান্দায় এসে বসেছিলেন। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কথা-বার্তা বলছিলেন বটে, তবে নিচু সুরে। তার সেই দাপট, . হাঁক-ডাকের চিহ্নমাত্র ছিল না কণ্ঠস্বরে।

ওঁরা চলে যাওয়ার আগের দিন বিকেলে একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে এসেছিল। লোকটির ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়স হবে। বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। রাজা তার পথ আগলে গর্জন করে উঠতেই ও ডাক্তারবাবু। ও মৃগাঙ্কবাবু। বলে চিৎকারে জুড়ে দিয়েছিল।

মৃগাঙ্কবাবু বেরিয়ে এসে রাজাকে বকুনি দিয়ে সরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার হরিবাবু?

-ডাক্তারবাবু আছেন? দাদা আবার সেইরকম।

—ও। আচ্ছা, আসুন ওপরে। স্যার ল্যাবরেটরিতে আছেন। শেখর তখন তার ঘরে ছিল। চট করে লোকটিকে দেখে নিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গিয়েছে সে। দাঁড়িয়ে থাকেনি বারান্দায়, ডাক্তার দেখলে চটে যাবেন। তার কানে এসেছে হরিবাবুর গলা —কদিন অফিসের কাজে বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে দেখি, দাদা ফের তেমনি শুনলে করেছে। বউদি কান্নাকাটি করছে।

—কিছু বুঝতে পারেননি আগে?

—না, ছিলাম না যে। দাদার শরীর খুৰ শুকিয়ে গিয়েছে। হাপের টানটাও বেড়েছে।

—ওষুধটা খাচ্ছিল ঠিকমতো?

—হ্যাঁ, তবে দু-এক দিন হয়তো ফাক গিয়েছে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই ওষুধটায় কাজ হচ্ছে তো? না পালটাবেন?

দেখি। ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘরে আসুন। এই অবধি শুনতে পেল শেখর। একটু বাদে শেখর দেখেছে হরিবাবুকে ফিরে যেতে। ডাক্তারের একটা লালরঙের ফিয়াট গাড়ি আছে। মৃগাঙ্কবাবুই যা ব্যবহার করেন। গাড়িটা।

আধঘণ্টা পরে ডাঃ ব্যানার্জিকে পাশে বসিয়ে মুগান্তবাবু গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর পরপর পাঁচদিন ডাঃ ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কবাবু সকালবেলা গাড়ি করে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

এই রোগী সম্বন্ধে কালোর মা কিছু বলতে পারল না শেখরকে। শুধু জানাল, স্থানীয় লোক এবং বছরখানেক আগে একবার এসেছিল ওর ভাইয়ের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কাছে। 'ভাই মাঝেমাঝে দেখা করে যায়, তবে রোগী আর আসেনি। কী রোগ সে জানে না।

শেখরের মনে অনেক প্রশ্নের ভিড়: মৃগাঙ্কবাবু বলেছিলেন, 'ডাঃ ব্যানার্জি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু কই, এখনও তো তিনি রোগী দেখেন—অদ্ভুত সব রোগ। এইসব রোগীদের বিষয়ে কৌতুহল দেখালে ডাক্তার অত রেগে যানই বা কেন? এমনকী গাঞ্চবাবুও অন্যদের সামনে এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে চান না। ব্যাপারটা কেমন যেন ধোঁয়াটে।

শেখর লক্ষ করল, হাবুর পিসিমা এবং হরিবাবুর 'আবির্ভাবের পর ডাঃ ব্যানার্জির রাত জাগা আরও বেড়ে গিয়েছে। দিনের বেলা তাকে যতটুকু ল্যাবরেটরির বাইরে দেখা যায়, ভীষণ ছটফটে, অন্যমনস্ক।

অবশ্য ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শেখরের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সে খাসা আছে। তবু সে ডাক্তারের ভাব-গতিক যতটা সম্ভব নজরে রাখতে লাগল।

পাঁচ

ডাক্তার কুঠিতে পর পর দুটো চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটে গেল। প্রথমে অ্যালসেশিয়ান কুকুর রাজা হঠাৎ গেল ক্ষেপে। নির্জন দুপুর। 'আচমকা বাজার ক্রুদ্ধ গর্জন এবং কালোর মার ভয়ার্ত চিৎকারে সারা বাড়ি সচকিত হয়ে উঠল। শেখর দোতলায় লাইব্রেরিতে ছিল, ছুটে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। মৃগাঙ্ক দত্ত এবং ডাঃ ব্যানার্জিও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন।

উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। তার মগডালে বসে থরথর করে কাপছ কালো। আর নিচে রাজা উন্মাদের মতো গজনি করছে আর লাফ মারছে কালোকে লক্ষ্য

করে। উঃ, কী ভীষণ তার মুর্তি! চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। গলায় ঝুলছে ছেড়া চেনের আধখানা।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, নিশ্চয়ই রাজাকে খুচিয়েছে কালো। আজ সকালেই বকুনি দিলাম, বারণ করলাম ক্ষেপাতে। ইস, দেখুন কাণ্ড!

ডাঃ ব্যানার্জি হকি দিলেন—খবরদার, কেউ বেরিও না বাইরে। সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও।

বাগানের মধ্যে বুধনের ঘরের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল বুধন। সে ঠিক ব্যাপারটা আঁচ করতে পারেনি। নিমেষে রাজা গজরাতে গজরাতে বুধনকে লক্ষ্য করে তিৰেগে ধেয়ে গেল। বুধন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে একলাফে ঘরে ঢুকে কপাট দিল আটকে। রাজা ঝাপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার গায়ে। বারকয়েক হুঙ্কার দিয়ে ঠেলাঠেলি করে দরজা খুলতে পেরে সে আবার ফিরে এল পেয়ারাতলায়।

“কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়েছে। ওকে এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। মৃগাঙ্কবাবু, আপনাদের বন্দুকটা কই? দিন আমাকে।" বলতে বলতে ছুটে যাচ্ছিল শেখর, থমকে দাড়াল ডাঃ ব্যানার্জির হুঙ্কারে—কোথায় যাচ্ছেন? রাজা পাগল হয়নি। ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। কাউকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমি দেখছি।

বলে তিনি হনহন করে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেলেন। বেরিয়ে এলেন একটু পরেই, হাতে কয়েকখানা বিস্কুট। | রাজা, রাজা!—ডাকলেন ডাক্তার।

অনেকক্ষণ লম্প-ঝম্প করে রাজা হাপাচ্ছিল। মাথা তুলে দেখল ডাক্তারকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বারান্দার নিচে। ডাক্তার বিস্কুটগুলো ছুড়ে দিলেন রাজার সামনে। এটু শুকে নিয়ে রাজা বসে পড়ে খেতে লাগল বিস্কুট। খানিক বাদেই সে মাটিতে শুয়ে পড়ে, দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। শেখর বুঝল, বিস্কুটে কোনো ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর বুধন ও ফাগুলাল ধরাধরি করে রাজাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিল একটা টেবিলে। ডাক্তার ও মৃগাঙ্কবাবু ছাড়া সবাই বেরিয়ে এল। ল্যাবরেটরি থেকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে শেখর। ডাঃ ব্যানার্জির কটা কথা ভেসে আসে তার কানেইঞ্জেকশনটা রেডি কর মৃগাঙ্ক।

ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চারটে দিন রাজাকে একটা বড় খাচার মধ্যে আটকে রাখা হল। শেখর লক্ষ করল, প্রতিদিন তাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। রাজা এই কয়েকদিন প্রায় সব সময় ঝিমোয়। তার হাবভাব একেবারে নরম হয়ে গিয়েছে। যখন জেগে থাকে, করুণ নয়নে চেয়ে যেন বোঝাতে চায়, আমায় বন্দি করে রেখেছ কেন?

পঞ্চম দিনে রাজাকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হল। সে ছোটাছুটি শুরু করল। বাড়ির লোক কিন্তু চট করে রাজার কাছে ঘেষতে ভরসা পেল না। ব্যতিক্রম কেবল ডাঃ ব্যানার্জি। মর্নিং ওয়াকের সময় আগের মতো রাজাকে সঙ্গে নিয়ে যান তিনি। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই অন্যদেরও রাজার সম্বন্ধে ভয় ভেঙে গেল। কালো আবার তার সঙ্গে খেলা শুরু করল। রাজা ক্ষেপে যাওয়ার ঠিক বারো দিন পরে।

সেদিন শেখর ত্রিকূট পাহাড়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছে। সারাটা দুপুর টোটো করে ফিরল বিকেলে। লক্ষ করল, গোটা বাড়ির আবহাওয়া কেমন থমথম করছে।

মুগাঙ্কবাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, শেখবালু, মাওলালকে দেখেছেন পাহাড়ের দিকে যেতে?

কই, না তো।

'ও।–মৃগাঙ্কবাবু চলে গেলেন চিন্তিতভাবে।

কিছু একটা ঘটেছে। বাড়ির খুটিনাটি খবরের যে সাক্ষাৎ গেজেট সেই কালোর মাকে প্রশ্ন করতে ফিসফিস করে যা বলল কালোর মা, তার সারমর্ম হচ্ছে এইঃ ঘণ্টাখানেক আগে ফাগুলাল কাজ করছিল বাগানে। তখন একজন গ্রামের লোক আসে। সে ফাগুলালের কাছে নাকি পয়সা পেত। বাঁশ বিক্রির দরুন। হঠাৎ আর্তনাদ শুনে সবাই তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে, লোকটাকে বেদম মারছে ফাগুলাল। বুধনকে তো গ্রাহ্যই করল না। শেষে ডাক্তারবাবু কড়া ধমক দিতে সে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালায়। লোকটা তারপর কাদতে কাদতে বলে, সে কোনো দোষ করেনি, একটাও কটু কথা বলেনি। শুধু বলেছিল, আজ তার পাওনাটা চাই। কারণ হাটে যাবে চাল কিনতে। তা-ই শুনে ফাও নাকি রেগেমেগে বলে, হবে না আজ ভাগ !

সে একটু জোর করতেই ফাগুলাল তেড়ে আসে। যাই হোক, ডাক্তার লোকটিকে টাকা-পয়সা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ফাগুলাল আর ফেরেনি।

শেখর রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেল। অমন শান্ত ভদ্র লোকটার এই ব্যবহারের কারণ? ফাগুলালের মন বোধহয় ভালো যাচ্ছিল না। গতকাল থেকে কেমন গুম মেরে ছিল।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ঘটনার জের কোন্ দিকে গড়াচ্ছে ঠাওর করতে পারল না শেখর।

আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা পুলিশ জিপ এসে ঢুকল বাড়িতে। মৃগাঙ্কবাবু এবং ডাঃ ব্যানার্জি তাতে চড়ে বসলেন। জিপে বসে ছিলেন স্থানীয় দারোগা এবং দু'জন কনস্টেবল। উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

ঘন্টা দুই পরে মোটর ইঞ্জিনের গর্জন পাওয়া গেল। হেডলাইটের জোরালো আলোয় চোখ ধাধিয়ে ডাক্তার কুঠির কম্পাউন্ডের ভিতর এসে থামল সেই পুলিশের জিপ। আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শেখর দেখল, জিপ থেকে নামছে ডাঃ ব্যানার্জি, মৃগাঙ্ক দত্ত, দারোগা এবং ফাগুলাল। ফাগুলাল মাথা নিচু করে রয়েছে। চারজন নীরবে এগিয়ে চলল, দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠল, তারপর ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করল। একটু বাদে বেরিয়ে এলেন দারোগা। সোজা গিয়ে উঠলেন জিপে। গাড়ি হু-শ করে বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে।

সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল অতি দ্রুত এবং প্রায় ছায়াবাজির মতো। নিচে নেমে শেখর কালোর মাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিল ফাগুলাল?

মদ খাচ্ছিল শুড়িখানায়। সেপাইগুলো বলাবলি করছিল, আমি শুনেছি। লোকটা অদ্ভুত। আগে এমনি একবার পালিয়েছিল রাগারাগি করে। তারপর দারোগাবাবু ধরে এনে দিল।

দারোগীর সঙ্গে চেনা আছে ডাক্তারবাবুর? আছে না? ওর মেয়ের যে চিকিছু করেছেন আমাদের ডাক্তারবাবু! কালোর মা সন্ত্রস্তভাবে জানাল, আমি এ-সব বলেছি কাউকে বলবেন না। ডাক্তারবাবু জানলে রাগ করবেন।

অদম্য কৌতূহল শেখরকে অধীর করে তুলল। দোতলার অন্য প্রান্তে জানালার কাচের শার্শী ভেদ করে ল্যাবরেটরির উজ্জ্বল আলোর রেখা বারান্দায় এসে পড়েছে। শেখর পা টিপে টিপে এগোল।

জানালা দিয়ে সাবধানে উকি মারল শেখর।

একটা টেবিলের ওপর ফাগুলালের অসাড় শায়িত দেহ। তবে বক্ষের মন্থর ওঠা-নামায় বোঝা যাচ্ছে, সে গভীর ঘুমে অচেতন। পাশে দাড়িয়ে মৃগাঙ্কবাবু। কাছে চেয়ারে বসে ডাঃ ব্যানার্জি। মৃগাঙ্কবাবু কিছু বলছেন ডাক্তারকে। জানালার ভেজানো পাল্লায় সামান্য ফাক। মৃদু কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শেখর জানলার নিচে বসে কান পাতল।

প্রথমে মিনিটখানেক সে ঘরের ভিতরের কথা-বার্তার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে পারল। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা। তারপরই সে উৎকর্ণ হল মুগাঙ্কবাবুর কথা শুনে।

মৃগাঙ্কবাবু বলছেন, স্যার, এবার কিন্তু আমাদের এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট অনেক ইমপ্রুভ করেছে। মনে আছে স্যার, আগের বার ফাগুলাল কী রকম ভুগিয়েছিল। দু'দিন ওর তো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তারপর ধরবার সময় সে কী ধস্তাধস্তি! আর এবার ডাকামাত্র কেমন সুড় সুড় করে চলে এল। রাজাও এবার ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।

-না না মৃগাঙ্ক, আমি কিন্তু বড় হতাশ হয়েছি। আমি খুব আশা করেছিলাম, দুটো কেসই সাকসেসফুল হবে। অন্তত নাইন্টি-পারসেন্ট সাকসেস। দুটো ফরমুলাতেই দেখাই বেশ খুত রয়ে গিয়েছে। আবার আমায় নতুন করে আনালিসিস করতে হবে। হ্যা, আমার দশটা ফ্রেশ হিউম্যান-ব্রেন চাই। জোগাড় করো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—শেখরবাবুর কেসটা কী মনে হয় স্যর? দেখা যাক। তিন মাস না গেলে তো ওষুধের রিঅ্যাকশন ঠিক বোঝা যাবে না। আ ততা করছি এবারের ফরমুলাটা...একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো মৃগাঙ্ক, তারপর তোমার ছুটি।

—আমি তো কিছু বলিনি স্যার।

বলোনি ঠিকই, কিন্তু আমি বুঝতে পারি। তোমার কষ্ট হচ্ছে। এই নিঃসঙ্গ একঘেমে জীবন। কী করব বলো? গুটিকতক লোকের আত্মত্যাগের ওপর বিজ্ঞানের বড় বড় সাফল্য নির্ভর করে, সে তো তুমি জানই।

ব্যস, ঘরে আর কোনো কথা নেই। একটু অপেক্ষা করে শেখর সরে এল।

নিজের ঘরে এসে শেখির নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তার তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বইছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব বুদ্ধি-বিবেচনা।

শেখর বুঝছে, ডাঃ ব্যানার্জি এক গবেষণা-মত্ত নির্মম বিজ্ঞানী। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজনে তার কাছে অন্যের ভালো-মন্দ, আনন্দ-বেদনা সব তুচ্ছ। তিনি নিশ্চয়ই কোনো এক্সপেরিমেন্ট করছেন এই কুকুর রাজা, মালি-ফাগুলালের ওপর, কোনো ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের শরীরে। এবং তার ফলে মাঝে মাঝে অমন ঠান্ডা মেজাজের শিক্ষিত কুকুর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ভদ্র শান্ত ফাগুলাল হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হাঙ্গামা বাধায়। অর্থাৎ এক বিকৃত মানসিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ওইসব ওষুধ——ডাক্তারের নিজের তৈরি গোপন ফরমুলা। হালুর পিসিমা, হরিবাবুর দাদা—এরাও বোধহয় ডাক্তারের খপ্পরে পড়েছেন।

তার নিজের ওপরেও হয়েছে পরীক্ষা। ভুয়া রোগের ভয় দেখিয়ে কারসাজি করে তার দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে অজানা ওষুধ। ওষুধ নয়, বলা উচিত বিষ। এক অনির্দিষ্ট ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় শেখরের দেহ-মন হিম হয়ে এল। বিপদকে সে ডরায় না। বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তার দিন কাটে। কিন্তু এ বিপদের প্রকৃতি সে কিছু হদিশ করতে পারছে না।

এই রহস্যের জাল তাকে ছিন্ন করতেই হবে। তিলে তিলে দুশ্চিন্তার আগুনে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে কোন বিভীষিকাময় ভবিতব্য। জেনে-শুনে তৈরি হয়ে সে এই অজ্ঞাত বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপনের লোভে সে এ কোন্ চক্রান্তের শিকার হল?

উদভ্রান্ত শেখর গভীর রাত অবধি শুয়ে শুয়ে ছটফট করে।

আট

সকাল আটটা নাগাদ নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন মৃগাঙ্ক দত্ত। শেখরকে ঢুকতে দেখে আহ্বান জানালেন—আসুন শেখরবাবু।

—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, মৃগাঙ্কবাবু। —ও, বেশ। বসুন। দেখুন মৃগাঙ্কবাবু, আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। খুব জরুরি প্রশ্ন! তার জবাব চাই। সঠিক জবাব। আজে-বাজে বলে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবেন না। তাতে লাভ হবে না— শেখর কঠোর দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

মৃগাঙ্কবাবু একটু ভুরু কুঁচকোলেন। কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর সহজ সুরে বললেন, বলুন কী প্রশ্ন। উত্তর জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

–আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, মনে আছে, আপনি বলেছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি এক আশ্চর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন ?

গবেষণার বিষয়টা কি জানতে পারি?

-সরি। এ বিষয়ে স্যারের অনুমতি ছাড়া আমি কিছু বলতে পারব না।

—ও। দেখুন, আমার বিশ্বাস, ডাঃ ব্যানার্জি কোনো ওষুধ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন। কুকুর রাজা আর মালি ফাগুলালের ওপর। তা-ই কি?

বোধহয় আমার ওপরেও এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। মৃগাঙ্কবাবু নীরবে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন।

এবং সেই এক্সপেরিমেন্টের ফল হচ্ছে মারাত্মক। এর ফলে নিরীহ ভদ্র কুকুর বা মানুষ কখনও কখনও উন্মত্ত অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুনুন মৃগাঙ্কবাবু, আমি জানতে চাই আমার বেলায় কী ঘটবে? কী রি-অ্যাকশন হতে পারে ওযুধের? একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, আপনি ভুল করছেন শেখরবাবু। আসলে কী যেন বলতে গিয়েও সামলে নিলেন মৃগাঙ্কবাবু।

বোগাস! গর্জে উঠল শেখর—মিথ্যে রোগের নাম করে একবার আমায় ধাপ্পা দিয়েছেন। আমি বোকা বা মূখ নই। বারবার আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। | মুগাথবাবু শান্ত স্বরে বললেন, কেন অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন শেখরবাবু? আপনি সত্যিই রোগগ্রস্ত। স্যার চিকিৎসা করে আপনাকে সুস্থ করে তুলতে চান।

—আমার কী হয়েছে? কী অসুখ? মৃগাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এ বিষয়ে আর আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব । আপনি ডাঃ ব্যানার্জির মুখেই সমস্ত শুনতে পাবেন। আমি ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি। পরে ডাকব আপনাকে।

মৃগাঙ্কবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ল্যাবরেটরির নিরালা কোণে প্রশস্ত ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি। চক্ষু নিমীলিত। দাঁতে কামড়ানো পাইপ। শেখর এসে কাছে দাঁড়াতে চোখ মেললেন। সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে বললেন, বসো।

শেখর বসল। রাশভারী ডাক্তারের সামনে এলে সে একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

ডাঃ ব্যানার্জি গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার প্রশ্ন শুনেছি। উত্তর পাবে। তার আগে শারীর বিদ্যা এবং আমার গবেষণা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। খুব সহজ করে বলছি, বুঝতে অসুবিধা হবে না। | মানুষ বা উন্নত ধরনের প্রাণীদের দেহ নানারকম জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি। মস্তিষ্ক শরীরের অঙ্গ। প্রাণীর সবরকম প্রবৃত্তি ও অনুভূতির কেন্দ্র এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক-চালনার মুলে আছে কিছু রাসায়নিক বস্তুর ক্রিয়া-কলাপ।

দেহের রাসায়নিক উপাদানগুলির আনুপাতিক হেরফেরের জন্যে একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক তারতম্য দেখা যায়। এই কারণে কোনো মানুষ হয় লখা, কেউ বেঁটে, কেউ কালো, কেউ বা ফর্সা, আর কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কেউ বোকা, রাগী, শান্ত-প্রকৃতির বা কল্পনাপ্রবণ হয়। মানুষ ও অন্যান্য উন্নত প্রাণীর মানসিক ক্ষমতা বা দুর্বলতার প্রধান কারণ তার শরীরে বা মস্তিষ্কে কিছু রাসায়নিক বস্তুর তারতম্য।

যেমন ধরো, দেহে কিছু কিছু ভিটামিন, মিনারেল, সল্ট, অ্যাসিড ইত্যাদির কম-বেশির ফলে কোনো কোনো লোক হয় প্রচণ্ড খিটখিটে, রাগী, হিংস্র, লোভী, আবার কেউ হয় প্রতিভাবান শিল্পী, গায়ক, বৈজ্ঞানিক।

দৈহিক বা মানসিক দোষ-গুণের অনেকখানি প্রাণীর সহজাত। উন্নত প্রাণীর প্রত্যেক দেহ-কোষের ভিতরে আছে সূক্ষ্ম সুতোর মতো দেখতে ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজাম তৈরি হয় ডি.এন.এ. নামে একরকম জটিল রাসায়নিক অণুর সাহায্যে। সন্তানের ক্রোমোজোম তৈরি হয় পিতা-মাতার ক্রোমোজোম থেকে। প্রতি

প্রাণীর ক্রোমোজোমের মধ্যে শুকনো থাকে সেই প্রাণীর ভবিষ্যৎ রূপ—তার দৈহিক ও মানসিক গঠন কা হবে। যমজ সন্তানদের ক্রোমোজোমের গঠনে খুব মিল, তাই তাদের চেহারা ও স্বভাবে এত মিল। দেখা যায়। আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণী কিছু স্বাভাবিক ক্ষমতা আর। দুর্বলতা নিয়ে জন্মায়। পরিবেশের প্রভাবে তার এইসব দোষগুণের কোনোটা ফুটে ওঠে, কোনোটা বা চাপা পড়ে যায়।

মনে রেখো, অতিরিক্ত ক্রোধ, লোভ, হতাশা, উত্তেজনা—এগুলো হচ্ছে আসলে মানসিক রোগ এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে পাওয়া। কোনো কোনো মানুষ প্রচণ্ড অপরাধ-প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। তারা সুযোগ খোজে। বারুদের ভুপের সামান্য সুলিঙ্গ যেমন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটায়, ঠিক তেমনি সামান্য ঘটনায় কম বয়স থেকে এরা মনের ভারসাম্য হারায়, এদের বিচার-বুদ্ধি-ধৈর্য লোপ পায়।

যে অবস্থায় পড়ে একজন মানুষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে খুন-জখম করে বসে, অর্থ বা অন্য প্রলোভন এড়াতে পারে না, অথচ একই অবস্থায় যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর এক জনকে দেখা যায় সংযত ও সৎ রয়েছে। কেউ নানাকারণে হতাশায় ভুগে ভেঙে পড়ে, কিন্তু কেউ কেউ আরও ঢের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে। এইরকম বিভিন্ন স্বভাবের প্রধান কারণ মানুষের ক্রোমোজোমের প্রকৃতি, তাদের দেহ-রসায়নের বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, দুর্বল ও বিকল হাত-পা-চোখ ইত্যাদি যেমন চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা যায়, তেমনি মস্তিষ্কের কাজে সরকম ক্রটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সমস্ত মানসিক ও স্নায়বিক রোগের চিকিৎসাও এক দিন সম্ভব হবে। আমি গবেষণা করে বুঝতে চেষ্টা করছি; বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রবণতার কারণ কী? শরীরের বা মস্তিষ্কে কোন্ কোন্ উপাদান কী পরিমাণে কমবেশি থাকার জন্যে এইসব প্রবণতার সৃষ্টি হয় ? ট্রিটমেন্ট করে। ওষুধ প্রয়োগে শারীর রসায়নের ক্রটি সংশোধন করে মানসিক রোগ সারানো যায় কী উপায়ে? কয়েক জাতের প্রাণীকে স্টাডি করলেও আসলে মানুষ নিয়েই আমার রিসার্চ।

ডাঃ ব্যানার্জি থামলেন। বারকয়েক টান দিলেন পাইপে। একটু হেসে বললেন, অনেক। বকলাম। বুঝলে কিছু?

শেখর মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। সে আমতা আমতা করে—হ্যা, মানে এই রাজা, ফাগুলাল, এরা সবাই বুঝি --

—রাইট। এরা আমার পেশেন্ট। রাজা ছিল আমার বন্ধুর কুকুর। খুব চালাক। কিন্তু বাচ্চা বয়স থেকে বদমেজাজি। দিনে দিনে রাগ বেড়েছে। বন্ধু আর রাখতে সাহস পাচ্ছিল। কয়েকজনকে কামড়ে ছিল শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে মেরে ফেলতে বাধ্য হত। আমি এনে চিকিৎসা করছি।

—আর ফাগুলাল?

—ও ছিল ডাকাত। দুর্দান্ত স্বভাব। জেল খেটেছে। এখন কেমন ভদ্র। কী চমৎকার বাগান করে দেখেছ?

—আর কোন পেশেন্ট আছে এ বাড়িতে?

—আছে, যেমন দীননাথবাবু। কেবল হতাশায় ভুগত। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। দু-বার। ওর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

—আচ্ছা, বুধন কি..

-না, না, ও রোগী নয়। বেজায় ভালো মানুষ। দিব্যি স্বাভাবিক। ওই চেহারাটাই যা।

—ওই হাবুর পিসিমা হরিবাবুর দাদা ওরাও কি মেন্টাল পেশেন্ট?

—হ্যা। হাবুর পিসিমা মাঝে মাঝে ভীষণ রেগে যেতেন। তখন ওঁর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। অনেকটা শান্ত করতে পেরেছি। আর হরিবাবুর দানার ঝোঁক ছিল নেশা করার, তা প্রায় ছাড়িয়েছি।

প্রশ্নটা বলি-বলি করে শেখর মুখে আনতে পারছিল না, এবার বলে ফেলল, আচ্ছা, আমি...আমার কী রোগ ? | সহানুভূতি-মেশানো কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, কতকগুলি মেন্টাল ডিফেক্টস ছিল তোমার। অবশ্য সবারই থাকে অল্প-বিস্তর। বাড়াবাড়ি হলেই বিপদ।

—আমার সম্বন্ধে কী জানেন আপনারা? —কিছু কিছু জানি বইকি। নইলে চিকিৎসা করতে চাইব কেন? —যেমন?

—যেমন, তোমার বাবা-মা নেই। আগে কাকার কাছে ছিলে। এখন একা থাক। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলে, কিন্তু বি.এ. পরীক্ষা না দিয়েই পড়া ছেড়ে দাও। স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল, বেপরোয়া এবং লোভী। সেলসম্যানের কাজ করো ঠিকই, কিন্তু কিছু স্মাগলার ও ক্রিমিনালের সঙ্গে মেশামেশি আছে। এবং তোমার পদবি ‘‘মিত্র' নয়, 'সরকার'।

স্তম্ভিত শেখর বলে উঠল, কী করে জানলেন?

খানিকটা আমার বন্ধু এক পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট থেকে। তোমার জ্বরের সময় ঠিকানা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমার ব্যাগ ঘাটতে ঘাটতে রিভলভারটা দেখে আমার সন্দেহ হয়। জ্বরের ঘোরে তোমার মুখে কয়েকটা কথা শুনে ব্যাপার খানিক আন্দাজ করি। তখন তোমার একটা ফোটো তুলে ফোটোসুদ্ধ মৃগাঙ্ককে কলকাতায় পাঠাই কমিশনারের কাজে তোমার সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে। এ ছাড়া তোমার চরিত্রের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাই তোমার দেহ-কোষ বিশ্লেষণ করে।

রুদ্ধনিঃশাসে শুনছে শেখর। ডাঃ ব্যানার্জির মুখ দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কিছুই জানেন তার সম্বন্ধে, তবে রেখে ঢেকে বলছেন।

সস্নেহ কণ্ঠে ডাক্তার আবার বললেন, ভয় নেই, তোমার এই পরিচয় আমি বা মৃগাঙ্ক ছাড়া আর কেউ জানে না এখানে। পুরনো দিনের কথা ভুলে যাও। কারণ তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

শেখর তার মানসিক পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ এবার বুঝতে পারছে। ধরা গলায় বলল সে, আমায় ক্ষমা করবেন, আমি ভুল বুকেছিলাম। কিন্তু ফাগুলালের মতো আবার কি আমার... ।

অমনি ডাঃ ব্যানার্জি উত্তেজিতভাবে উঠে পড়লেন। ঘরের মধ্যে অস্থির পদে পায়চারি। করতে করতে বললেন, হ্যা, ওইখানেই আমি ব্যর্থ হচ্ছি। আমার রিসার্চ অনেকখানি এগিয়েছে। বেশির ভাগ মানসিক রোগ আমি এখন সারিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু মাঝে। মাঝেই রিল্যান্স করছে। কোথায় যে একটু গন্ডগোল...।

ডাঃ ব্যানার্জি থামলেন। তারপর শেখরের দিকে অনুনয়ের সুরে বললেন, প্রার্থনা করো শেখর, যেন আমার সাধনা সফল হয়। দেখো, অপরাধের জন্যে

চোর-ডাকাত-খুনিদের আমরা জেলে পাঠাই, শাস্তি দিই। কিন্তু লোকে এটা ভুলে যায়, তাদের মধ্যে অনেকেই মানসিক রোগী। এইসব অপরাধের জন্যে আসলে দায়ী তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া শারীর রসায়ন, তাদের ক্রোমোজোম। এদের সুস্থ করে তোলার, এদের মানসিক গঠন বদলাবার চেষ্টা হয় না। সমাজ তাদের ঘৃণার চোখেই দেখে। তাই জেলের মেয়াদ শেষ হলে তার বেশির ভাগ আবার ফিরে যায় তাদের পাপের জগতে। কিন্তু উচিত জেলে বা মানসিক হাসপাতালে আটক রাখার সময়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা করা। সংক্রামক রোগী আরোগ্যলাভের পর আর পাঁচজনে তো স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে মেশে। তেমনি মানসিক রোগমুক্ত অপরাধীর সঙ্গে সকলে মেলামেশা করবে। জানো শেখর, সহজাত অপরাধ-প্রবণতার তাড়নায় কত প্রতিভাবান মানুষের জীবন অকালে শেষ হয়ে যায়। তাদের গুণ ও প্রতিভা অসৎ প্রবৃত্তির তলায় চাপা পড়ে নষ্ট হয়। এইসব মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করে ভালো করে তুলতে পারলে সমাজের অপরিমেয় উপকার হবে। সাধারণতঃ অল্প বয়স থেকেই অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছোট-খাটো অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাতে হবে-বড় অপরাধে পা বাড়াবার আগেই। এমনকী কাউকে চোখে না দেখেও তার চরিত্রের খুঁতগুলি স্পষ্ট না জেনেও শুধু তার দেহের কোষ ও নানা উপাদানের অ্যানালিসিস-রিপোর্ট স্টাডি করেই টের পাওয়া যাবে তার মধ্যে শী কী মানসিক রোগের বীজ সুপ্ত আছে। সে-ই বুকে রোগ প্রকাশের আগেই হবে চিকিৎসা। এইভাবে মানুষের প্রতিভার, তার সগুণের বিকাশের পথ যাবে খুলে।

কথা শুনতে শুনতে ল্যাবরেটরির ভিতরটা লক্ষ করছিল শেখর। ল্যাবরেটরির ভিতর সে দু-তিন বার এলেও এই কোণটায় আসেনি আগে। রাইটিং-টেবিলের ওপরে ফ্রেমে-বাঁধানো ছোট একখানা ফোটো দেখে চমকে উঠল সে—এ-ই সেই মুখ! ডাঃ ব্যানার্জির মুখের সঙ্গে কী দারুণ মিল! তাই ডাক্তারকে দেখা পর্যন্ত এত চেনাচেনা ঠেকছিল।

ফোটোখানা দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, এ ছবি কার? ডাক্তার থমকে গেলেন। প্রখর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি চেন একে?

-না, তবে ছবি দেখেছি। বোধহয় খবরের কাগজে। অনেক দিন আগে। আমার ছোট ভাই। ডাক্তার বললেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, অসাধারণ মেধা। ভালো চাকরিও করত। কিন্তু ও ছিল ভীষণ লোভী অর্থ, সম্পদ, বিলাসিতার লোভ। মোটে সংযম ছিল না। সর্বদা ধার-দেনায় জড়িয়ে থাকত। বোধহয় আমার ঠাকুর্দার রক্তের ধারা

পেয়েছিল। একটা নোট জাল করার মেশিন তৈরি করেছিল কোনো দুষ্ট লোকের উস্কানিতে। অমন নিখুঁত জাল নোট এদেশে নাকি আর হয়নি। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। এবং জেল হওয়ার আগেই 'আত্মহত্যা করল লজ্জায়।

মনে পড়েছে। খুব হই-চই হয়েছিল ঘটনাটায়। ওর পরিণতিই আমার এই রিসার্চের কারণ। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন ডাঃ ব্যানার্জি। তিনি উত্তরের খোলা জানলার সামনে গিয়ে শেখরের দিকে পিঠ ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি উদাস, অন্তরে বুঝি কোন দূর অতীতের বেদনাময় স্মৃতির রোমন্থন। শেখর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সাত ডাঃ ব্যানার্জির চিকিৎসায় ফাগুলাল আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, ফিরে এসেছে তার আগেকার স্বভাব। সাত-আট দিন সে নিজের ঘরেই ছিল। প্রায় সারাক্ষণ ঘুমুত ওষুধের প্রভাবে। কালোর মা তার দেখাশোনা করত, অবশ্যই সর্বক্ষণ গজগজ করতে করতে।

ফাগুলাল আগের মতোই বাগানে কাজ করে, ফুল গাছের যত্ন নেয়, নিজের মনে টুকরি, মোড়া ইত্যাদি বানায়, রাতে বাঁশি বাজায়। কয়েক দিন সে একটু সঙ্কুচিতভাবে কাটিয়েছিল। তারপর বাড়ির লোকের খোলামেলা ব্যবহার পেয়ে ফের সহজ হয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ফাগু 'ভালো হয়ে গিয়েছে, আর রাগারাগি করবে না।

ব্যস, এ বাক্য কালোর মা, বুধন, মায় কালো অবধি শিরোধার্য করে নিল। কালোর মার ধারণা, ডাক্তারবাবু ফালালকে খুব বলেছেন, শাস্তি দিয়েছেন।

এক পরম প্রশান্তির মধ্যে শেখরের দিন কেটে যাচ্ছে। আনন্দময় অনুভূতিতে তার মন সবসময় ভরে থাকে। এই অনুভব তার আগেও হচ্ছিল, কিন্তু তখন মাঝে মাঝে কলকাতার কথা মনে জেগে উঠত। এখান থেকে ফিরে আবার সেই জীবনযাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ভেবে কেমন একটা অবসাদ ও বিতৃষ্ণতায় অন্তর ভারী হয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে জানে, পুরনো পরিবেশে ফিরে যাওয়ার তার আর দরকার নেই। এখন তার সামনে শুধু ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল নতুন জীবনে পদক্ষেপ।

কখনও সারাটা দিন সে বাগানে তার স্টুডিওতে কাটায়। টুকিটাকি যন্ত্রপাতি মেরামত করে, ছবি আঁকে, বই পড়ে। কোনো কোনো দিন বেড়াতে যায় কাধে

ক্যামেরা বুলিয়ে।

মৃগাঙ্ক দত্তর সঙ্গে শেখরের অন্তরঙ্গতা আরও নিবিড় হয়েছে। প্রথম দিন শেখর এক আড়ষ্ট ছিল – মৃগাঙ্ক তার অতীত ইতিহাসের অনেকখানি জানেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর হাবভাব তার সব সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিল। শেখরের অতীত নিয়ে মুগাঙ্কবাবুর কোনো মাথাব্যথাই নেই, সেসব দিন শেখরের জীবন থেকে বুঝি সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। তার কাছে একমাত্র সত্য আজকের শেখর—এক সুস্থ সুশ্রী বুদ্ধিমান যুবক। মৃগাঙ্কবাবু মাঝে মাঝে শেখরের স্টুডিও বা শোওয়ার ঘরে হানা দেন, হাসি-ঠাট্টায় আসর জমিয়ে তোলেন। শেখরও মেতে ওঠে গল্পে। এই উদার-হৃদয় যুবকটিকে বড় আপন মনে হয় শেখরের।

একদিন মৃগাঙ্কবাবু বললেন, আমাদের আর ওই বাবু-টাবুবা আপনি-আজ্ঞে চলবে না। ওতে কেমন বাদে-বাধো ঠেকে, আচ্ছা তেমন জমে না। এবার থেকে আমি মৃগাঙ্ক, তুমি শেখর। কী, রাজি?

শেখর খুশি হয়ে বলল, ঠিক বলেছ।

সেদিন সন্ধের সময় উন্মুক্ত প্রান্তরে বেদির মতো দেখতে প্রিয় পাথরখানার ওপরে গিয়ে বসল শেখর। কিরকিরে বাতাস বইছে। দিনে ঝা-ঝ রোদুরের পর ভারি আরামদায়ক। অজানা বনফুলের হালকা সুবাস আসছে ভেসে। কাছেই এক নিঃসঙ্গ শালগাছ।

মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে শেখরের। মারা যাওয়ার আগে দু-বছর মা বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। দেওরের সংসারে উদয়াস্ত খাটুনি ও তাচ্ছিল্য, এদিকে তাঁর বড় আদরের একমাত্র সন্তান শেখর কোথায় তাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি দেবে, তা নয়, ক্রমশ সে গোল্লায় যাচ্ছে খারাপ সঙ্গে মিশে। মা সেটা ঠিক টের পেতেন। রাগারাগি, কান্নাকাটি করতেন। ক্ষণকালের জন্যে নরম হত শেখরের মন। কিন্তু অচিরে ভেসে যেত সব সাধু সংকল্প, নিষ্ফল হত মায়ের অনুযোগ, অশ্রু-বিসনি। যে কোনো উত্তেজনাময় জীবন শেখরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। নিষিদ্ধ কাজে উত্তেজনার মাত্র বড় বেশি। তাই জাল-জুয়াচুরি, চোরাকারবারি ইত্যাদি সমাজ-বিরোধী গোপন কার্যকলাপ, অনায়াসে অঢেল টাকা উপার্জনের পন্থা তাকে মোহগ্রস্ত করত, রোমাঞ্চিত করত। বেঁচে থাকলে মা আজ কত খুশিই না হতেন শেখরের পরিবর্তন দেখে! অনুতপ্ত শেখর পরলোকগতা মায়ের কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করল।

জীবনটাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে। ছেলেবেলায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কত রঙিন ছবি ভাসত কল্পনায়। সেগুলিকে কি বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় না? ডাক্তার ব্যানার্জি ও মুগাঙ্কের মতে, তার মধ্যে নাকি অনেক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। ঠিকমতো চর্চা করতে পারলে সে নাকি যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করতে পারবে। কলকাতার দিনগুলো, পুরনো সাঙ্গোপাঙ্গদের স্মৃতি যেন ইতিমধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

তবে মাঝে মাঝে একটা ভয়, গভীর একটা আশঙ্কা জেগে ওঠে মনে: তার মানসিক ভারসাম্য আবার যদি বিকল হয়! আগেকার দুর্বুদ্ধিগুলো যদি ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই মানসিক পরিবর্তনকে ডাক্তার যে বেশি দিন ধরে রাখতে পারছেন না।

মৃগাঙ্ক বলেছিল যে, সাধারণত প্রথমবার ট্রিটমেন্টের পর মানুষের বেলা তিন মাস এবং কুকুর প্রভৃতি পশুর বেলা ঠিক দু'মাস পরেই পুরনো মানসিক ঝোকগুলো ফিরে আসে। দ্বিতীয় বা পরেরবারের চিকিৎসার ফল অবশ্য অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়, অন্তত দেড়-দু বছর থাকে ওষুধের প্রভাব। শেখরের বেলায় চিকিৎসার পর তিন মাস কুড়ি দিন কেটে গিয়েছে। তাই তাদের আশা, হয়তো তার দেহ-রসায়নের পরিবর্তন স্থায়ী হতে চলেছে, এত দিনে হয়তো সার্থক হতে চলেছে বিজ্ঞানীর দুলহ তপস্যা।

আরও চার-পাঁচ দিন কেটে গেল।

সেদিন সকাল থেকে শেখরের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। মাথা ধরেছিল। কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে শেখরের মনে বেশ গর্ব আছে। তাই এই সামান্য শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু সে কাউকে বলতে লজ্জা পেল। ভাবল, এ কিছু নয়, গত দু রাত অনেকক্ষণ জেগে বই পড়ার ফল। আজ ভালো ঘুম হলে ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন শেখর বিকেলে মাঠ বা পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেল না। গেল শহরের বাজারে—ঘড়িঘর অঞ্চলে। কিছু কেনাকাটা দরকার। মেঘলা দিন, দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জোলো বাতাস বইছে।

বাস টার্মিনাসের সামনে কালীমাতা কেবিনের বেঞ্চিতে বসে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছিল শেখর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাস এসে থামছে, বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার রওনা

হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামায়, ফিরিওলাদের চিৎকারে, কনডাক্টরদের হাঁকডাকে জায়গাটা সরগরম।

হঠাৎ একটা কালোরঙের অ্যামিবাসাডর গাড়ি এসে থামল কিছু দূরে। চারজন লোক নামল গাড়ি থেকে। একজন দ্রুত পায়ে প্রবেশ করল একটা খাবারের দোকানে। বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির কাছে। তাদের একজনের ওপর চোখ পড়তেই শেখরের হৃদপিণ্ডের রক্ত যেন চলকে উঠল।

গঙ্গাপ্রসাদ ওরফে গ্যাড়া গঙ্গু।

গাড়ির কাছে অপেক্ষমাণ তিনজনের মধ্যে এক ব্যক্তি উচ্চতায় বেশ খাটো, কিন্তু পুটি প্রশস্ত এবং অত্যন্ত গাট্টাগোট্টা জোয়ান। মুখখানা তার ফুটবলের মতো গোল, মাথায় চুল কদমছাট, শিকারি বেড়ালের মতো পাকানো গোঁফজোড়া, চোখে কালো গগলস পরিধানে দামি স্যাট। লোকটা সিগারেট খাচ্ছে। এই লোকটি স্মাগলার কুপাল সিংয়ের দক্ষিণ হস্ত —গাড়া গঙ্গু নামে খ্যাত।

কপাল সিং যেদিন শেখরকে তার আচ্ছায় ডেকে এনে অপমান করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল, গঙ্গু পাশে দাঁড়িয়ে কুৎসিত উল্লাসে হাসছিল, রগড় দেখছিল। কৃপাল সিং যখন শেখরকে বের করে দেওয়ার হুকুম দিল, এই গঙ্গই তাকে ঘাড়ধাক্কা মেরে দরজার বাইরে পার করে দিয়েছিল।

দুর্জয় রাগে শেখরের মাথার ভিতরটা দপদপ করতে লাগল। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল গাঙ্গুর পানে। ভুলে গেল চারপাশের দোকান-পাট, মানুষজনের অস্তিত্ব।

একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে জাগল শেখরের-ছুটে গিয়ে দশ আঙুলে সাড়াশির মতো গসুর গলাটা টিপে ধরে। কিন্তু এখন সে নিরস্ত্র।আর গঙ্গু ছুরি বা পিস্তল সঙ্গে না নিয়ে এক পাও হাঁটে না। তাছাড়া সংখ্যায় ওরা-চার, সে এক। সুতরাং ইচ্ছেটাকে সে দমন করতে বাধ্য হল।

একটু পরে ফিরে এল গাড়ির চতুর্থ ব্যক্তি। হাতে এক ডাঙারি খাবার। সবাই উঠল গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে রওনা হল।

শেখর খানিকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল দোকানে। তারপর পয়সা চুকিয়ে বেরোল রাস্তায়। দিশেহারার মতো সে পথে পথে ঘুরতে লাগল। মগজে যেন

আগ্নেয়গিরির প্রলয়কাণ্ড চলছে। কী ভাবছে ওই গঙ্গু, তুপাল সিংয়ের দল? শেখর ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে ভেবে নিশ্চয়ই তারা হাসাহাসি করে। ওরা নিশ্চয়ই ভাবে, শেখর ইদরের মতো গর্তে লুকিয়েছে, আর মাথা তোলার হিম্মত নেই। শেখরের বন্ধু-বান্ধবেরাও তাকে নিশ্চয়ই কাপুরুষ ভাবছে।

হ্যা, প্রতিশোধ চাই—নির্মম প্রতিশোধ! নিজের ওপর ধিক্কার জাগল শেখরের—এখানে কী করছি আমি? অপদার্থ! এত বড় অপমানটা বেমালুম হজম করে গুড বয় হওয়ার সাধনা করছি। ছোঃ!

ভদ্র সৎ জীবন-যাপন চুলোয় যাক! কায়ক্লেশে দুটো পয়সা রোজগার, কোনোমতে দিন গুজরান তার পোষাবে না। শেখর চায় 'অর্থ, ভোগ, প্রতিপত্তি এবং চায় খুব তাড়াতাড়ি, তা সে যে পথেই আসুক না কেন। ন্যায়-অন্যায়ের নীতি-বোধ নিয়ে কি সে ধুয়ে খাবে? সোজা পথে যে সে অর্থ ও খ্যাতি উপার্জন করতে পারবে তার গ্যারান্টি কোথায় ? মৃগাঙ্করা হচ্ছে সুখ-পালিত জীব। কী বুঝবে ওরা শেখরের জ্বালা? আবার সে ঝাপিয়ে পড়বে পুরনো জগতে। কৃপাল সিং গঙ্গুরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে, শেখরকে শায়েস্তা করা অত সোজা নয়। তবে হ্যা, শেখর হুট করে কিছু করবে না, হিসেবনিকেশ করে হুঁশিয়ার হয়ে এগোবে। দল পাকাবে, তারপর নেবে বদলা। ক্রমে একদিন সে হয়ে উঠবে কলকাতার চোরাকারবারি সমাজের মুকুটহীন রাজা। অবশ্য পুলিশের নজর আছে তার ওপরে। কিন্তু তাতে কী?

এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছে শেখর। সহসা তার খেয়াল হল, সে ডাক্তার কুঠিতে ঢুকে পড়েছে।

অন্যমনস্কভাবে রাতের খাবার খেল শেখর। মৃগাঙ্ককে এড়িয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। ঘুম গেল উবে। অবিরাম পায়চারি করে চলল, একটার পর একটা সিগারেট খেল। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করল।

কোনো একটা ছুতো করে ও সরে পড়বে এখান থেকে। বলবে, "কয়েক দিন ঘুরে আসছি" ব্যস, তারপর হাওয়া। ডাক্তার বা মৃগাঙ্ক তাকে জোর করে আটকে রাখতে চাইলে সে বরদাস্ত করবে না। ডাঃ ব্যানার্জির এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হওয়ার জন্যে সে মোটেই দাসখত লিখে দেয়নি।

কলকাতায় এন্টালির ঠিকানাটা পালটাতে হবে। কাল বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করবে টেলিফোনে।

ঢং ঢং ঢং! রাত তিনটে ঘোষণা করল বারান্দার দেওয়াল ঘড়ি। শেখর ভাবল, থাক। এখন, কাল ঠান্ডা মাথায় প্ল্যানগুলো ছকতে হবে।

রিভলভারটা বের করে দেখল ও। চেম্বারে টোটা খতম! বোধহয় ডাক্তার সরিয়ে রেখেছে। যাকগে, গুলি জোগাড় করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন কর্ম নয়।

চেয়ারে বসল শেখর। একসময় তার অজান্তে দু চোখের পাতা বুজে এল তার।

আট

শেখরের ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গিয়েছে। মুখের ওপর একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে।

এ কী, আমি চেয়ারে বসে কেন!শেখর অবাক হল। তারপর তার মনে পড়ে গেল গতকালের ঘটনা—গঙ্গু কৃপাল সিং। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল সে।

মাথাধরা কমেছে একটু। তবু অনিদ্রায় শরীর ভার ভার। আজ তার অনেক কাজ। ভাবতেই তার শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুঃসাহসে ভর করে বিপদের স্রোতে পাড়ি দিতে, বেপরোয়া জীবনের স্বাদ পেতে সে চিরদিনই উল্লাস বোধ করে।

চটপট ব্রেকফাস্ট করে শেখর সাইকেলে বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য-ঘড়িঘর-বাজার।

দোকান-পাট তখন সবে খুলেছে। রেডিওর দোকান কুণ্ডু ব্রাদার্সের মালিক গণপতি কুন্ডুর সঙ্গে শেখরের বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছে এ কদিনে। কুন্ডুর দোকানে টেলিফোন আছে অফিসঘরে শো-কেসের পিছনে। শেখর গিয়ে বলল, নমস্কার কুতুমশাই, একটা ট্রাংককল করতে দেবেন? আমাদের বাড়ি থেকে লাইন পাচ্ছি না, বোধহয় বিগড়েছে বলে সে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল—যা লাগে, নেবেন।

করকরে নোটখানা পকেটস্থ করতে করতে কুণ্ডুমশাই একগাল হাসিলেন— আজ্ঞে, করবেন বইকি কল। তার জন্যে আবার পয়সা কেন? হেঁ হেঁ, তবে বুঝলেন কিনা, ফোনের চাজ যা বেড়েছে! নইলে এই সামান্য উর্গারটুকু কি আর.. ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেখর বধুর লাইন পেল।

হ্যালো, বন্ধু আছে?

—আমি বন্ধু বলছি।

—আমি শেখর।

—হ্যাল্লো বস, তুমি! আমি তো ভাবলাম...

—কী ?

—না, মানে, কোনো পাত্তাই নেই। তা, কবে আসছ?

—শিগগিরই, দু-তিন দিনের মধ্যেই। ওদিককার খবর কী?

—খুব ভালো। ভেরি ভেরি গুড। গোমেজের সঙ্গে সিংয়ের জের ফাইট লেগে গিয়েছে ব্রীজরামকে নিয়ে। আঃ, কী মোক্ষম খবর দিয়েছিলে দাদা! শুনেই গোমেজ ফায়ার। দু দলের তিনটে লোক জখম হয়েছে। গোমেজের দলের একজন এখনও হাসপাতালে। পিঠে

হ্যা, গোমেজ তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সিংকে একচোট দেখে নিতে চায়।

—আর ইদ্রিস শেখ? বলেছিলে তাকে?

—আলবৎ। আমায় ডিউটি দিলে ফঁক পাবে না বস। ইদ্রিস রাজি। কমিশন বেশি পেলে তোমার হয়ে কাজ করবে। তবে গোড়ায় ছিু অ্যাডভান্স চায়।

বেশ, দেব। আর কোনো খবর?

–হ্যা, বাহাদুর এসেছিল পরশু। নেপাল থেকে অনেক টাকার হজমিগুলি সাপ্লাই আসছে দিন পনেরোর মধ্যে, খোঁজ করছিল তুমি নেবে কিনা। সস্তা রেট।

নিতে পারি। বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলব গিয়ে। ওকে অপেক্ষা করতে বোলো।

—যাক, এসে পড়ছ তো শিগগিরই ?

–আঃ, বাচালে। তা আছ কোথায় অদ্দিন ডুব মেরে ?

—পরে বলব। শোনো, একটা বাড়ি খুঁজে রেখো আমার জন্যে। দমদম বা বরানগরে, একটু নিরিবিলি চাই। আচ্ছা, চলি। গুড লাক!

যাক, ওদিককার কাজ অনেকখানি হাসিল। তবে সটকে পড়ার আগে এখানে দুটো জরুরি কাজ বাকি। এক, ডাক্তারের সেই মহামূল্যবান প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিটি হাতাতে হবে। ইদানীং ওই মূর্তিগুলো নিয়ে এরা কেউ মাথা ঘামায় না। ঘরে তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সুতরাং একটা মূর্তি খোয়া গেলে কেউ খেয়ালই করবে না আপাতত। দুই, নারায়ণ কুটারের বাবাজি ওরফে প্রাক্তন দারোগা খাস্তগিরের সঙ্গে একটা পুরনো দেনাপাওনার ফয়সালা করতে হবে—একদা এক অসহায় নিরপরাধ তরুণকে নির্দয়ভাবে প্রহার করার বিচার। বক-ধার্মিক খাস্তগিরকে সে খতম করে যাবে। খাস্তগির প্রতিদিন ভোররাত্রে তপোবন পাহাড়ে বেড়াতে যায়। শেখর রাত থাকতে গিয়ে ওই পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবে। এবং তারপর এক বৃদ্ধকে খুন করে কোনো গর্তে ফেলে দেওয়া তো নেহাতই ছেলেখেলা। খাস্তগির মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপর সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে দু-চার দিন কাটিয়ে আসে। অতএব তার অন্তর্ধান কয়েকদিন কেউ গায়েই মাখবে না। ইতিমধ্যে শেনো বুনো জন্তু মৃত দেহটার সদগতি করে ফেলবে। আর খুন হয়েছে বোঝা গেলেও তার 'ভয় কী? শেখর যে কস্মিনকালে খাস্তগিরকে চিনত, কেউ জানে না।

আরও একটা লোভ হয়। ডাক্তারের আয়রন-চেস্টে প্রচুর নগদ টাকা মজুত আছে, শেখর দেখেছে। সিন্দুকের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে যাবে নাকি? নাঃ, থাক্ হাজার হোক, বিপদের সময় উপকার করেছে।

শেখর বাড়ি ফিরে লাইব্রেরিতে একটা বই হাতে নিয়ে বসে রইল। মিউজিয়ামঘরের চাবির গোছা মৃগাঙ্কর ঘরে একটা পেরেরাকে টাঙানো থাকে। শেখর তা জানে। মুগাঙ্ক একবার ল্যাবরেটরিতে ঢোকামাত্র সে চট করে মৃগাঙ্কর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চাবি নিয়ে, যে ঘরে বিষ্ণুমূর্তি আছে তার দরজার তালা খুলে, মূর্তিটা বের করে ফের তালা দিল। তারপর মুর্তি নিজের

ঘরে লুকিয়ে রেখে এল এবং চাবি রেখে এল যথাস্থানে। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

একটা ছুরি জোগাড় করতে হবে—বেশ ধারালো বড় ছুরি। বাগানের স্টুডিওতে একখানা এমনি ছুরি আছে, তাতেই কাজ উদ্ধার হতে পারে। শেখর ধীরে-সুস্থে নিচে নামল।

উঠোনে থাবায় মুখ রেখে টানটান হয়ে শুয়ে আছে রাজা। সামনে মাটিতে দুটো চড়ুই পাখি নেচে বেড়াচ্ছে, রাজা জুলজুল চোখে নজর করছে তাদের। তাড়া লাগাবার মতলব আজিহে বোধহয়। শেখরের পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। ফাগুলাল গোলাপ বাগানে খোঁড়াখুড়ি করছে আপনমনে। শেখর সতর্ক চোখে চারধারে দেখে নিয়ে দল খুলে স্টুডিও ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘরখানি পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। একধারে তক্তপোশ, তাতে শতরঞ্চি পাত তার ওপর নানা ধরনের যন্ত্রপাতিহাতুড়ি, বাটালি, ক্রু-ড্রাইভার, ছুরি ইত্যাদি ছি; রাখা। একটা ট্রানজিস্টার রয়েছে আধখোলা অবস্থায়। দেয়ালে ঝুলছে শেখরের তোলা ডাক্তার-কুঠির একখানা এনলার্জ-করা ফোটো। মেঝেতে চাটাই পীতা। স্ট্যান্ডের গায়ে হেলানো অবস্থায় শেখরের আঁকা একটি প্রায়-সমাপ্ত রঙিন ছবি—ক্ষীণকায়া খরস্রোত পাহাড়ি ঝরনা খাড়া উঁচু থেকে লাফিয়ে নামছে শিলাখণ্ডের বুকে ফোয়ারার মতো জল ছিটিয়ে। দুপাশে ঝোপ-জঙ্গল।

শেখর ঘরের মধ্যে একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। অন্য এক অনুভূতি, বিচিত্র কল্পনাময় এক জগতের স্পর্শ চকিতে অনুভব করল হৃদয়ে। অনেক স্মৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনি তার মনে ভিড় করে এল। আর হয়তো সে কোনো দিন ছবি আকবে না। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ক্যামেরায় বন্দি করে রাখার মতো অবসর আর কি সে পাবে? যে উত্তেজনাময় জীবনের টানে সে ছুটে চলেছে, সেখানে সূক্ষ্ম রুচি বা সৌন্দর্যচর্চার স্থান কোথায় ? আচ্ছা, যে জীবন সে বেছে নিতে চলেছে তা চিরকাল তার ভালো লাগবে তো? ওই স্কুল জীবন-যাত্রা কি কিছুকাল পরে তার কাছে ক্লান্তিকর ঠেকবে? এখানকার কটা দিন বড় আরামে কাটল। এই জগৎটা ছেড়ে যেতে তাই কেমন মায়া হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে।

অসৎ উপায়ে অর্থ-উপার্জন করে হয়তো সে চুটিয়ে বিলাস-ব্যসন উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু লোকের শ্রদ্ধা বা প্রীতি কি অর্জন করতে পারবে কখনো? না বোধহয়। সুখ, শান্তি, সম্মান বিসর্জন দিয়ে শুধু অর্থ-চিন্তা, উত্তেজনা, ভোগ ও

কুসল সত্যিই সে কি চায়? দ্বিধাগ্রস্ত শেখরের মন দুলতে লাগল। কিছু স্থির করতে পারে না সে, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। দু হাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো টলতে লাগল শেখর।

—কী হয়েছে শেখর? শরীর খারাপ নাকি? কাল থেকে দেখছি তুমি কেমন যেন-- মৃগাঙ্কের গলা। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে সে।

উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাল শেখর। তারপর চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, হ্যা, শরীরটা কেমন যেন... জানো মৃগাঙ্ক, আমি বোধহয় আবার সেই আগের মতো,

নিমেষে মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল শেখরের অবস্থা। কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে কোমল স্বরে বলল, কোনো ভয় নেই। এসো আমার সঙ্গে।

দু'জনে দোতলায় উঠল। মৃগাঙ্ক বলল, তুমি বসো এখানে। আমি স্যারকে ডেকে আনছি।। শেখর বারান্দায় চেয়ারে বসল। মৃগাঙ্ক ঢুকল ল্যাবরেটরিতে।

একা হতেই শেখরের চিন্তাশ্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু কাল-আরে, বোকর মতো কাণ্ড করলাম। নার্ভাস হয়ে নিজের পায়ে হড়ল মারলাম। কে চায় নিরীহ পানসে ভালোমানুষের জীবন? শেখরের ভাগ্যলিপি আলাদা। গুলি মারে এই শুরুঠারমার্ক ভদ্রলোকেদের উপদেশে!

ক্ষণিক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সজাগ হয়ে উঠল শেখর। এখনও সময় আছে, ম্যানেজ করে কেটে পড়ার। তাকে আবার চিকিৎসা করার সুযোগ যেন ওরা না পায়। সে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

-শেখর কোথায় যাচ্ছ?

মৃগাঙ্কর ডাক শুনে সিড়ির মুখে শেখরের গতি রুদ্ধ হল। বলল, নিচে যাচ্ছি।

—নিচে কেন?

এমনি কাজ আছে।

সে কী। কেমন লাগছে শরীর? -শুধোল মৃগাঙ্ক।

—ফার্স্টক্লাস!

-মানে! মানে, মজা করছিলাম। অ্যাকটিং। কেমন ভড়কি দিলাম বললা—শেখর জোরে হেসে ওঠে।

মৃগাঙ্ক সামনে এসে দাঁড়াল। শেখরের কাঁধে হাত রেখে তীক্ষ চোখে তার মুখে চেয়ে বলল, ঠিক বলছ?

হ্যা...কী আশ্চর্য, এর মধ্যে আবার মিথ্যে বলতে যাব কেন? -শেখর বিব্রতভাবে ঘাড় ফেরাল।

–ভাই শেখর শেষে আমাকেও ফাকি দিতে চাই। আমি সব বুঝেছি। এসো।

ওই স্নেহমাখা কথাকটি শোনামাত্র শেখরের সব প্রতিরোধ শিথিল হয়ে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, দেখতে পেল, ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসছেন ডাঃ ব্যানার্জি।

শেখরকে নিয়ে মুগাঙ্ক ও ডাক্তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। শেখরকে শোয়ানো হল একটা টেবিলে। তাকে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন ডাক্তার। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে ঢলে পড়ল শেখর।

তিন-চার দিনের মধ্যে শেখর আবার সুস্থ হয়ে উঠল। ফিরে এল তার মানসিক প্রশান্তি, তার শিল্পবোধ। কলকাতার পুরনো জগতে ফেরার কথা সে এখন ভাবতেই পারে না। গত কয়েক দিনের ঘটনা আগাগোড়া তার কাছে কেমন স্বপ্নের মতো অলীক মনে হয়।

ডাক্তার ব্যানার্জি বা মৃগাঙ্কর কাছে ব্যাপারটার কিন্তু বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের ভাবখানা, যেন নেহাত তুচ্ছ অসুখ করেছিল শেখরের, ওষুধ খেয়ে সেরে গিয়েছে, বাস।

বরং মৃগাঙ্ক রসিকতা করে মাঝে মাঝে—কী হে শেখর, হঠাং তেজ বেড়েছিল যে? সুখে থাকতে ভূতে কিলায়?

'ভালো কথা, একাকে বিষ্ণুমুর্তিটা ফের যথাস্থানে রেখে এসেছে শেখর সুস্থ হওয়ার পর পরই।

ডাঃ ব্যানার্জি বলেছেন যে, শেখর আদৌ আগেকার মানসিক অবস্থায় পুরোপুরি ফিরে যেত না। কারণ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, শেখরের দেহে রাসায়নিক উপাদানগুলির যে ভারসাম্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তা সামানাই বিচলিত হয়েছিল। ব্যাপারটা আরও বুঝিয়ে বলেছেন উনি, তোমার মানসিক রোগের কারণ ছিল তোমার দেহে দু রকম রাসায়নিক পদার্থের খুব বেশি অভাব। সেই অভাব পূরণ করে দিতেই তোমার দুর্বলতা কেটে গিয়েছিল। প্রায় চার মাস পরে আবার ওই রাসায়নিক উপাদানগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য কমে যায়। এর জন্যে অল্প অস্থিরতা বোধ করার অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি তোমার হত না। কয়েক দিন রেস্ট নিলে ঘাটতি আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আকস্মিক উত্তেজনা। ফলে মনের পুরনো প্রবৃত্তিগুলি আবার জেগে উঠেছিল। তবে এই অবস্থা স্থায়ী হত না—শিগগিরই তোমার উত্তেজনা কেটে গিয়ে শুভবুদ্ধি ফিরে আসত। এবং তখন স্বভাবতই জাগত অনুশোচনা। আমার এক্সপেরিমেন্ট এত তাড়াতাড়ি এতটা সফল আর কখনও হয়নি। আগেও একটি কেসে আমি সফল হয়েছি, তবে এত দ্রুত সে সাফল্য আসেনি।

শেখরের মনে উদগ্র কৌতূহল জাগল—কে সেই ভাগ্যবান যার মাধ্যমেই ডাক্তার তাঁর প্রথম সাফল্যের মুখ দেখেন? কিন্তু তার এই বাড়তি কৌতূহল ডাক্তার পছন্দ করবেন কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে সে চুপ করে রইল। তবে এই মুহূর্তে মৃগাঙ্কের প্রতি সে পরম তত বোধ করল। এই মানুষটিই তাকে রক্ষা করেছে সর্বনাশের গ্রাস থেকে। একবার ভুল করে বসলে আর তো তার ফেরার উপায় থাকত না।

অনেক চিন্তা করে শেখর স্থির করেছে, এখানে আর তার থাকা চলবে না। তাকে পালিয়ে যেতে হবে আরও অনেক দূরে—তার বিগত জীবনের দূষিত আওতার অনেক বাইরে।

মৃগাঙ্ক তার অভিসন্ধি জেনে বেজায় আপত্তি জুড়ে দিল। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ডাঃ ব্যানার্জির কাছে। ডাক্তার শুনে প্রশ্ন করলেন, তুমি দূরে যেতে চাও কেন?

শেখর বলল, আমার পুরনো সঙ্গীদের হাত থেকে বাঁচতে। আমি জানি, পুলিশ আমার অপরাধের প্রমাণ পেলে, আমি জেল খাট। সে বরং এক হিসেবে ভালো-অন্যায় করার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। সে শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু

সিংয়ের দলের হাতে আমি মরতে চাই না। এত কাছে থাকলে ওরা আমার খোঁজ পেয়ে যাবে। তাছাড়া চোরাকারবারি কাজে আমার সাঙ্গোপাঙ্গরাও হয়তো আমার এই পরিবর্তনকে সুনজরে দেখবে না। তাদের অনেক কুকীর্তির এমন জলজ্যান্ত সাক্ষী ধার্মিক বনে গিয়ে যদি পুলিশকে সব ফাস করে দেয়। আমি তাদের কাছে এখন বিপজ্জনক। তাই আমি আপাতত এদের নাগালের বাইরে যেতে চাই।

ডাঃ ব্যানার্জি শেখরের মনোভাব খানিকটা বুঝলেন। তাই বাধা দিলেন না। বললেন, কোথায় যেতে চাও?

দক্ষিণ ভারতে। মাদ্রাজে কিংবা মাইসোরে। দেখি কোথায় সুবিধে হয়।

বেশ, মাইসোরে আমার এক বন্ধুর কফির বাগান আছে। ইচ্ছে করলে চাকরি করতে পার সেখানে। চিঠি দিয়ে দেব। তারপর বিদেশে যাওয়ার সাধ থাকলে ব্যবস্থা করা যাবে। হ্যা, কিছু পিল দেব, হপ্তায় একটা করে খাবে তিন মাস। বেশি রাত জাগা চলবে না, অন্তত বছর খানেক। আর সাত-আট মাস পরে একবার আসবে আমার কাছে চেক-আপ করাতে। ভয় নেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার এই নতুন ফিফজিওকেমিক্যাল সিস্টেম আর কখনও ডিস্টার্বড হবে না। হলেও সামান্য হতে পারে। একটা ওষুধ দেব, সঙ্গে রাখবে। কোনো অস্থিরতা টের পেলেই খেয়ে নেবে এক ডোজ।

শেখরের ইচ্ছে, সে বছর দুই এদেশে কাটিয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে। পড়াশোনা করবে। ভালো করে শিখবে ফোটোগ্রাফির কাজ। অনেক দেশ বেড়াবে, ছবি তুলবে। তারপর ফিরবে ভারতবর্ষে।

কিছুক্ষণ পরে মৃগাঙ্ক শেখরকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। একগোছা নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, রাখ।

-কেন?

–তোমার যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার জন্যে লাগবে। আমি জানি, তোমার হাতে বেশি পয়সা নেই। না।

-শেখর মাথা নাড়ল।

—তোমার চলবে কী করে?

শেখর তার বলিষ্ঠ বাহদুটি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এ দুটো আছে কী করতে? একটা পেট তো, ও ঠিক চলে যাবে। শেখরের মুখ দেখে মৃগাঙ্ক বুঝল জোরাজুরি নিষ্ফল। শেখর টাকা নেবে না।

টাকা শেখরের আছে। প্রচুর টাকা। বর্ধমানেরই এক ব্যাঙ্কে প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকা জমানো আছে। কিন্তু সে স্থির করেছে, ও টাকা সে ছোঁবে না। কারণ ও টাকা পাপের পথে অর্জিত। ওই অর্থ সে ভবিষ্যতে দান করবে কোনো মানসিক রোগের হাসপাতালে বা ডাঃ ব্যানার্জির গবেষণার জন্যে।

তিন দিন পরে এক সকালে শেখর ডাক্তার কুঠি থেকে বিদায় নিল। মৃগাঙ্ক সঙ্গে এল গিধনি স্টেশনে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে।

ট্রেনে জানলার ধারে বসে শেখর। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্ক। শেখর বলল, জানো মৃগাঙ্ক, একটা কথা ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে।

—কী কথা?

—আমিই ডাঃ ব্যানার্জির প্রথম সাকসেসফুল কেস। যখন ডাক্তারের রিসার্চের কথা লোকে জানতে পারবে, আমি তখন বিখ্যাত হয়ে যাব।

মৃগাঙ্ক একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, সরি।

-মানে?

—ডাঃ ব্যানার্জির প্রথম সাকসেসফুল কেস তুমি নও, আমি।

—আঁ! তুমি!!

–হ্যা, আমিও মানসিক রোগী ছিলাম। ছাত্র অবস্থা থেকেই কত কুকর্ম যে করেছি! ভীষণ নিষ্ঠুর ছিলাম। লোককে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়াতেই ছিল আমার আনন্দ।

খুনে-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে মিশতাম। এখন ভাবতে কেমন লাগে। তবে বুদ্ধি ছিল মেডিক্যাল পাশ করতে আটকায়নি। হয়তো পুরোপুরি ক্রিমিনাল হয়ে যেতাম

পরে। স্যার আমায় চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। শেখর খানিকক্ষণ থ হয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কত দিন লেগেছিল সারতে?

—পাকা পাঁচটি বছর। চারবার আমার মেন্টাল ব্যালান্স আপসেট হয়ে যায়, পালিয়ে যাই ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে। স্যার খুঁজে পেতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে এনে আবার আমার ট্রিটমেন্ট করেন। ক্রমে একেবারে সুস্থ হই।

একটু থেমে মিচকে হেসে আবার বলে মৃগাঙ্ক, তাই তো ব্রাদার, সেদিন আমায় ঠকাতে পারনি। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম ব্যাপার। আমি যে ভুক্তভোগী!

সিগন্যালের সবুজ সংকেত, গার্ডের ফ্ল্যাগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের দীর্ঘ দেহটা নড়েচড়ে উঠল, আস্তে আস্তে গড়াতে শুরু করল চাকা। শেখরের হাত চেপে ধরে মৃগাঙ্ক বলে উঠল, নিয়মিত চিঠি দেবে কিন্তু, নইলে ভীষণ রাগ করব। আর সাত-আট মাস কেন? আগেই চলে এসো। বড্ড একা একা লাগবে। আড্ডা মেরে মেরে অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে ভাই।

ক্রমে গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়ায়। মৃগাঙ্ক হাত নাড়ছে তাকে লক্ষ করে। শেখর বোঝে এই মানুষটির স্নেহের বন্ধন। ডাঃ ব্যানার্জির ঋণও সে কোনো দিন ভুলতে পারবে না। তার মানে বিচ্ছেদের বেদনা, তবু এক নবজন্ম লাভের সৌভাগ্যে এক গ্লানিমুক্ত আশা ভরা নতুন জীবনের হাতছানিতে তার হৃদয় অপূর্ব উল্লাসে ভরপুর হয়ে উঠল।

সমাপ্ত